প্রবীণ সাহিত্যিক

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ভূমিকা

জীবন নিয়েই সাহিত্য। গ্রহের সঙ্গে উপগ্রহের মতো এখানে জীবনকে ঘিরে সাহিত্যের পরিক্রমা। এই পরিক্রমা একটি মহৎ জীবনকে কেন্দ্র করে। সেই অসামান্য জীবন সমসাময়িক নানা মানুষ আর নানা সমস্যার ভিতর দিয়ে একটি বিক্ষুব্ধ যুগকে শুধু প্রত্যক্ষই করেনি, সাহিত্যের দর্পণে তার বিচিত্র দেশকালজয়ী রূপকে প্রতিফলিত করেছে।

জীবন ও সাহিত্যকে আলাদা না করে আমি তাই সাধ্যমতো সেই দ্রষ্টা এবং স্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি। কতদূর সক্ষম হয়েছি, সে-বিচার পাঠকেরা করবেন। আমার দিক থেকে শুধু এইটুকু বলবার আছে যে, জ্ঞানত কোনো চরিত্রকে আমি স্বমহিমাচ্যুত করিনি।

বহু বিদগ্ধ ও বন্ধুজন আমাকে সেকালের অনেক স্মৃতিকথা শুনিয়েছেন। প্রাসঙ্গিক বহু গ্রন্থও এ-কাজে আমি ব্যবহার করেছি। স্মৃতিকথক ও গ্রন্থকর্তাদের সকলের কাছেই আমি একান্তভাবে ঋণী।

নন্দদুলাল চক্রবর্তী

শরৎচন্দ্রিকা

১

খুঁটিতে হেলান দিয়ে প্যারী পণ্ডিত গভীর ঘুমে অচেতন। পাঠশালায় তাঁর হয়ে পাহারা দিচ্ছে সর্দার পড়ুয়া ট্যাপা।

শ্লেটটা বুকের কাছে ধরে ন্যাড়া অঙ্ক কষছিল। হঠাৎ কচি মেয়েলী গলায় দূর থেকে একটা ডাক ভেসে এল—

'ন্যাড়াদা…'

শুনে শ্লেটসুদ্ধ ন্যাড়া একটু বিচলিত হল। তারপরই শ্লেটটা নামিয়ে রেখে বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠল, 'ধুত্তোরি, নিকুচি করেছে কাঠাকালির…'

কথাটা যাতে সকলের কানে যায়, এমনভাবেই ন্যাড়া বলেছিল। শুনে সবাই খলবল করে উঠল। সদানন্দ গলা চড়িয়ে বলল, 'মুখে কালি দে না উদিকে ওই ট্যাপাটার…। দুবেলা অঙ্ক করো আর অঙ্ক করো। আর সহ্য হয় না।'

সবাই হেসে উঠে সায় দিল। ট্যাপা এমনভাবে চোখ লাল করে তাকাল যেন এখুনি সবাইকে খেয়ে ফেলবে।

হৈ-হট্টগোলের মধ্যে ন্যাড়া একবার জানলার দিকে তাকাল। একটি ফুটফুটে মেয়ে বই বগলে নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে তাকে হাত দিয়ে ইশারা করে ডাকছে।

ন্যাড়া গম্ভীরভাবে ট্যাপাকে বলল, 'আমি চললুম জল খেতে।'

ট্যাপা তাকে বাধা দিল। বলল, 'একটু আগেই না তুই জল খেয়ে এলি। ওসব হবে না। আগে আঁক, পরে…'

ন্যাড়া তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল, '—তাক্।' তারপরে এগিয়ে যেতেই ট্যাপা খপ্ করে তার হাত ধরে ফেলল। হেঁচকা

টানে হাতটা ছাড়িয়ে নিতে গিয়ে ন্যাড়ার হাতের দোয়াতটা ঠং করে ট্যাঁপার কপালে লাগল। ট্যাঁপা সঙ্গে-সঙ্গে কপাল চেপে ধরে ব্যথায় চীৎকার করে বসে পড়ল। তার সারা গায়ে কালি। পড়ুয়ারা তাই দেখে এ ওর গায়ে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

সেই হৈ-হট্টগোলের মধ্যে প্যারী পণ্ডিতের ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি বেতটা তুলে নিয়ে বললেন, 'কি কি কিরে! অখদ্দে মামদো! ঠিক দুপুরবেলায় শুধু-শুধু অমুন ষাঁড়ের মতন চিল্লে মরছিস কেনে?'

ট্যাঁপা কাঁদতে-কাঁদতে তার দুরবস্থার কথা যখন বর্ণনা করতে লাগল, তার ঢের আগেই ন্যাড়া পাঠশালা থেকে সরে পড়েছে।

'বটে!'—প্যারী পণ্ডিত লাফিয়ে উঠে বললেন, 'চল তবে। দেখি কোথায় সে।'

পাঠশালার পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে গাঁয়ের রাস্তা। একটু এগোলে একটা আমবাগান। গাছের ডালপালায় বাগানের ভেতরটা অন্ধকার। বড় একটা কেউ যায় না সেদিকে। এর মধ্যে একটি গাছের তলা খানিকটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ইট আর কাঠের টুকরো দিয়ে সেখানে বসবার বেদী তৈরি হয়েছে।

বেদীর ওপর থেকে একটি ছেলে ও একটি মেয়ের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল।—

'দেখ্ ধীরু, ওই ট্যাঁপার মাথাটা আমি যদি ফুটো করে না দিই তো আমার নাম ন্যাড়া নয়।'

নরম গলায় জবাব এল: 'কেন মিছিমিছি ওর ওপর এত রাগ করছ, ন্যাড়াদা?'

'ও, খুব যে দরদ দেখছি!'—ন্যাড়া রাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে পকেট

থেকে গুলি-লাট্টুগুলো বার করে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অন্য একটা গাছের গোড়ায় গুম হয়ে বসে পড়ল।

ধীরু তার কাছে এগিয়ে যেতে-যেতে বলল: ‘ছি, বড় উল্টো বোঝো তুমি। এই ন্যাড়াদা, ন্যাড়াদা, শোনো…’

ন্যাড়া তেমনি গুম হয়ে বসে রইল। ধীরু ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক করে সাধাসাধি করল। ন্যাড়া তার দিকে ফিরেও তাকাল না। শেষকালে অভিমান করে ধীরু চলে যাবার জন্যে যেই পা বাড়িয়েছে অমনি ন্যাড়া উঠে গিয়ে খপ্ করে তার হাত ধরে ফেলে গালে-মুখে বেশ কয়েকটা কিল-চড় লাগিয়ে দিল। ধীরু মার খেয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

ধীরুকে কাঁদতে দেখে তবে ন্যাড়ার রাগ পড়ল। ধীরুর পিঠে কালশিটে পড়ে গেছে। খানিক পরে ধীরুর পিঠে-মুখে হাত বুলিয়ে দিয়ে ন্যাড়া তাকে শান্ত করতে লেগে গেল—

‘চুপ কর, লক্ষ্মীটি, কাঁদিসনে। জানিস তো রাগলে আমার মাথার ঠিক থাকে না।’

ধীরু একটু পরে কান্না থামিয়ে বলে, ‘তুমি যে বড় উল্টো বোঝো, ন্যাড়াদা।’

বাগানের রাস্তায় ঠিক সেই সময় কাদের যেন পায়ের শব্দ শোনা গেল।

‘ইদিকে পন্‌মশাই, ইদিকে। উদিকতন ন্যাড়া পেলিয়েচে বলে মনে হয়।’

গলা শুনেই বোঝা গেল ট্যাপা। প্যারী পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে ন্যাড়াকে খুঁজতে বেরিয়েছে।

প্যারী পণ্ডিতের গলা শোনা গেল।— ‘বটে, চল্ তবে পা চালিয়ে।’

পায়ের শব্দ ক্রমেই ন্যাড়াদের ঝোপের দিকে এগিয়ে আসছে। ধীরু ভয় পেল। বলল, ‘কী হবে এখন, ন্যাড়াদা?’

হাতে একটা ঢিল নিয়ে তাক করে ছুঁড়তে-ছুঁড়তে ন্যাড়া বলল, 'হবে ট্যাপার মাথা আর মুণ্ডু।'

'উঃ, আর এট্টু হলেই মাথাটা আমার গিয়েছিল আর কি। না না, উদিকতন আর যাবেন না, পন্‌মশাই।'—ঝোপের আড়াল থেকে ট্যাপা চেঁচিয়ে উঠল।—'এ নিশ্চয় ন্যাড়ার কীর্তি।'

ভয়ে পিছিয়ে গিয়ে প্যারী পণ্ডিত বললেন, 'তা মন্দ বলিস্‌নি ট্যাপা। চ ফিরেই যাই। দেখি মতিবাবুকে বললে যদি কিছু হয়। বাব্বা, ছেলে তো নয়, ডাকাত।'

পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতে ধীরু ভয়ে-ভয়ে জিগগেস করল, 'বাড়িতে যদি ওরা বলে দেয় ?'

ন্যাড়া নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিল : 'দেবে।'

'যদি মারে আমাদের ?'

'মারবে।'

'যদি ফের পাঠশালায় পাঠায় ?'

'তখন তোকে আমি খুব করে কিলোবো।'

'এ্যাঁ !'

'হ্যাঁ, শোন্‌।'—ধীরুর কানের কাছে মুখ এনে ন্যাড়া ফিস্‌ফিস্‌ করে কী যেন বলল। তারপর মুখ সরিয়ে নিয়ে বলল, 'বুঝলি ? মনে থাকে যেন। আমি এখন চলি তাহলে। বসন্তপুরের হাটবার আজ। ছিপ একখানা আমায় কিনতেই হবে।'

ধীরু ভয়ে-ভয়ে তাকে আঁকড়ে ধরে বলল, 'না না, ন্যাড়াদা। বেলা গড়িয়ে গেছে, হাটে গিয়ে কাজ নেই তোমার।'

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ন্যাড়া বলল, 'দূর ! ভয় কিসের ? নয়নদা আছে না ! তুই যা এখন। যা বললুম মনে থাকে যেন।'

জনবিরল সরু রাস্তাটা প্রকাণ্ড ঝোপের মুখে বাঁক নিয়েছে। আশেপাশে জমাট রক্তের মতো কালো অন্ধকার। একটু আগে বসন্তপুরের হাট সেরে নিজেদের মালপত্র নিয়ে একদল লোক আলো আর লাঠি হাতে খুব হুঁশিয়ার হয়ে ঝোপটা পেরিয়ে চলে গেল।

এ রাস্তায় চোর-ডাকাত-ঠ্যাঙাড়ের সাঙ্ঘাতিক উপদ্রব। সন্ধ্যের ঝোঁকে তারা ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে থাকে। বাঁশের পাবড়া চেপে ধরে মানুষকে দুমড়ে-মুচড়ে খুন করতেও তাদের বাধে না।

নির্জন রাস্তা।

কাঁটালতায় হু-হু করে হাওয়া লাগে। কেমন একটা শব্দে চমকে-চমকে ওঠে স্তব্ধতা।

ঝোপের আড়াল থেকে দুজন লোক বেরিয়ে এল। লম্বা তেল-চকচকে পাকানো গোঁফ। পরনে ল্যাঙট। মাথায় ফেট্টি। গলায় নীল সুতো দিয়ে আঁটোসাঁটো করে বাঁধা পেতলের ছোট্ট তক্তি। সারা গায়ে তেলমাখা। হাতের পাবড়া দুটো পাকা বাঁশের তৈরি। গাঁটগুলো পেতলের পাত দিয়ে মোড়া।

এদিক-ওদিক বার কয়েক দেখে নিয়ে খানিকটা আড়ালে দাঁড়িয়ে তারা বলাবলি করছিল, 'নাঃ, দিনটাই মাটি।'

যাকে বলা হল সে তার তেলচুকচুকে পাবড়াটার গাঁটগুলো কচলাতে-কচলাতে মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ করে জবাব দিল, 'লসীব লসীব! হেঁ—নইলে এমন পাবড়ায়…'

'তা সে পাবড়া গে তোমার ছুইটে ছেলম তো ঠিক, বাছারাম টুনিপাখির মতন ঘুরেও পড়েছেলো—কিন্তু মালটি যে এমন ধনেখালির জমিদার, তা কে জানত? শা-লা! টাট্‌কা রক্ত এখনও দল্‌-দল্‌ করতেছে ঘাসের উপ্‌রি!'

'আরে দ্যাখ্‌, দূরে কারা আসে না?'

'জয় মা কালী!'

শিকার কাছাকাছি আসতেই পর-পর দুটো পাবড়া তাদের দিকে ছুটে গেল।

হাট সেরে ফিরছিল ন্যাড়া আর দুর্দান্ত লাঠিয়াল নয়নচাঁদ। তাদের সঙ্গে একটা বড়োসড়ো গরু।

চোখ পড়তেই নয়ন তার হাতের লাঠি দিয়ে ছুটন্ত পাবড়া দুটো ঠেকিয়ে দিল বটে, কিন্তু লাঠিটাও সেই সঙ্গে তার হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল।

নয়নের পেশীবহুল হাতের কয়েক জায়গা ছিঁড়ে গিয়ে রক্ত ঝরছিল। কিন্তু সেদিকে তার খেয়াল নেই। গুণ্ডা দুটোর হাত খালি, নয়ন এটা লক্ষ্য করেছিল। বাঘের মতো সে তাদের ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ল।

ন্যাড়া ততক্ষণে গরুটাকে দূরের একটা গাছের গায়ে বেঁধে ফেলেছে।

নয়নের হাতের মার খেয়ে দু-দুটো গুণ্ডা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ন্যাড়া তাদের অবস্থা দেখে ফোড়ন কেটে বলল, 'বড় যে তখন পাবড়া ছুটিয়েছিলে। এখন ?'

গুণ্ডাদের একজন চটে-মটে হুঙ্কার ছাড়ল, 'হাতি খানায় পড়েছে। নইলে তোর কল্‌জেটা ছিঁড়ে দিত, রে বিট্‌লে ছোঁড়া।'

ন্যাড়া ভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে এল।

গুণ্ডাটাকে নয়ন এবার এমন একটা মোক্ষম ঘা দিল যে বেচারার মুখ দিয়ে আর টুঁ শব্দ বেরোল না।

গুণ্ডাদুটো মার খেয়ে-খেয়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে।

নয়ন এবার রওনা হবার জন্যে উঠল। যেতে-যেতে শুধু বলল, 'থাক পড়ে বিল্লির বাচ্চা।'

চলতে-চলতে ন্যাড়া বলছিল, 'ওদের ওই গোঁফজোড়াই সার। যেন একেকটা কেটোবেড়ালের ল্যাজ। না, নয়নদা ?'

'আর মস্করায় কাজ নেই। চল্‌ দাদাভাই, পা চালিয়ে।'

একটু পরে গুণ্ডা দুটো জ্ঞান ফিরে পেয়ে উঠে বসল। একজন ঘোরলাগা গলায় বলল, 'এ দেখছি, বাবারও বাবা আছে।'

সন্ধ্যের পর ভুবনমোহিনীর কোলের কাছে বসে ধীরু শুধু একবার শেষ চেষ্টা করল : 'বিশ্বাস করো, জ্যাঠাইমা—পাঠশালে ন্যাড়াদা কোনো দৌরাত্ম্যি করেনি। পণ্ডিতমশাই শুধু-শুধু জেঠুর কাছে লাগিয়েছে।'

মৃদু হেসে তার পিঠে হাত বুলোতে-বুলোতে ভুবনমোহিনী বললেন : 'তাই বুঝি, ধীরু মা?'

'হ্যাঁ, জ্যাঠাই। ওরা যা বলেছে, ঠিক তার উল্টো। এই দেখ না তার সাক্ষী।'

বলে ধীরু তার পিঠের জামা তুলে কালশিটের দাগ দেখাল। —'দেখলে তো? বিশ্বাস হল তো?'

ভুবনমোহিনী ভারাক্রান্ত গলায় বললেন, 'আ-হ্-হা, মা-রে! কচি দেহে নিররুদের মতো কি এমনি করে হাত তুলতে হয় গো! আ-হা-হা!'

'আর, শুধু আমাকে নয়, জ্যাঠাই—ন্যাড়াদাকেও। ওই ট্যাপাকে বাধা দেবার জন্যে ন্যাড়াদা এগোতেই পণ্ডিতমশাই তাকেও ধরে মারলে। এমনি তো আমাদের ওপর হামেশাই চলে। কী—না, অঙ্কটা আমরা ভালো বুঝতে পারিনে। এই অপরাধ। তাতেই এমন বিষনজরে আমরা পড়েচি যে, তোমারে আর তা কি বলব, জ্যাঠাই—তুমি গুরুজন···'

'থাক মা, আমি বুঝিচি। আর তোমার ও-পাঠশালে গিয়ে কাজ নেই। তোমার মাকে আমি গিয়ে বুঝিয়ে বলবখন।'

ধীরু বুঝল তার অভিনয়ে ফল হয়েছে। এবার সে আসল কথা পাড়ল : 'কিন্তু ন্যাড়াদাকে তবে কেন তোমরা ভাগলপুরে নিয়ে যাচ্ছো, জ্যাঠাই?'

'কে বললে?'

'জ্যেঠু বিকেলের দিকে বলছিল পণ্ডিতমশাইকে। আমি সমস্ত শুনলুম আড়াল থেকে। হুঁ...হুঁ, আমিও তাহলে তোমাদের সঙ্গে যাবো, এই কিন্তু বলে রাখলুম।'

ভুবনমোহিনী হাসিমুখে বললেন, 'আমার পাগলী মেয়ের কথা শোনো। তুই এখন বড়সড় হবি, টুকটুকে ফুটফুটে ভালো বরের সঙ্গে তোর কেমন বিয়ে হবে—তখন না একেবারে যাবি এখান থেকে।' বলে ধীরুর মাথায় ভুবনমোহিনী হাত রাখলেন।

তড়বড় করে ধীরু বলে উঠল, 'ইল্লি! ফুটফুটে বর! ন্যাড়াদাকে ছাড়া আর কাউকে আমি বিয়েই করব না।'

অস্থিরভাবে নখ খুঁটতে-খুঁটতে ধীরু একটু পরে ডাগর চোখ তুলে বলল, 'বড় যে নিয়ে চলেচো ন্যাড়াদাকে, পড়বে কোথায়—শুনি ?'

'কেন ? অক্ষয় পণ্ডিতের কাছে !'

ধীরু এবার নিরুপায়ের মতো ভুবনমোহিনীর বুকের মধ্যে মুখ নিয়ে গিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

২

দেবানন্দপুর ছেড়ে আসতে প্রথম-প্রথম ন্যাড়ার কষ্ট হয়েছিল বৈকি। কিন্তু আস্তে-আস্তে নতুন জায়গায় মন বসে গেল।

ভাগলপুরের গা দিয়ে গেছে গঙ্গা। ধার বরাবর কত যে ঘাট। এপাশে-ওপাশে দুর্গম ঘন জঙ্গল, গা-ছমছম-করা পোড়ো বাগানবাড়ি। আর, বিচিত্র চরিতের সব মানুষ।

মানিক সরকার ঘাটের একপাশে অসংখ্য ঝুরি-নামা প্রাচীন বটগাছ। ঠিক যেন একটা জটী বুড়ি। জটী বুড়ির ঘাড়ে চেপে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে সে কী মজা।

আশেপাশে রহস্যভরা বাগান। তার মধ্যে পুকুরের চারপাশ জুড়ে নাচের মুদ্রায় দাঁড়িয়ে তালগাছের সারি। পাকা চাতাল। পাকা গাঁথুনির বেঞ্চি। শানবাঁধানো ঘাট। ধাপে-ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে পুকুরের কাঁচকাটা জলে। তালগাছের মাথা ডিঙিয়ে ঠিকদুপুরে সূর্য ঠিকরে পড়ে। ওদিকে আম জাম নারকেলের বীথি। মাঝে-মাঝে ভেসে আসে দেহাতী পাখির মধ্যদিনের শ্লথমন্থর ডাক।

লোকজন বড় একটা আসে না সে সময়। আসে শুধু চঞ্চল চোখে চপল-সংসদ। নির্ভীক কৌতূহলী দলের পাণ্ডা ন্যাড়া। আর তার সঙ্গে মণি, সুরেন, দেবেন, গিরীন, উপেন।

অভিভাবকদের চোখ এড়িয়ে নিত্য চলে শাসন বারণ তুচ্ছ করার খেলা। ঘাটের রানারে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায় ছিপ হাতে ফাৎনার দিকে তাকিয়ে। কে জানে, জলবালা চটুল মৎস্যকন্যারা হয়তো অভিসারে আসবে!

এমনি করে দলবল নিয়ে চলে ন্যাড়ার দামাল জীবনযাত্রা।

ন্যাড়া ভর্তি হয়েছে দুর্গাচরণ বালক বিদ্যালয়ে ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে। বোধোদয়-পদ্যপাঠ ছেড়ে এবার তার প্রবেশ চারুপাঠ, সীতার বনবাস, সদ্ভাব সদ্‌গুরু, ব্যাকরণের রাজ্যে। প্যারী পণ্ডিতের চেয়েও ঢের শক্ত পাল্লায়—অক্ষয় পণ্ডিতের হেফাজতে। গুরুমশাইয়ের ছিল রামচিমটি কিন্তু পণ্ডিতমশাইয়ের বাগান-কোপানো চড়।

অক্ষয় পণ্ডিতের দশাসই চেহারা। ঘাড়ে-গর্দানে একমাথা ঝাঁকড়া চুল। ইয়া গোঁফ, ইয়া দাড়ি। চোখ দুটো যেন ভাঁটার মতো। বাজখাঁই গলা।

ছাত্রদের বশে রাখবার দুটি মোক্ষম অস্ত্র তাঁর আয়ত্তে। এক তো নির্ভেজাল খাঁটি চড় ; আর দ্বিতীয় হল ছাল-ছাড়ানো লকলকে বেত।

ন্যাড়া কিন্তু মুখ বুজে তা মেনে নিল না। পণ্ডিত মশাইয়ের মারের কোনো কাটান নেই—এ হতেই পারে না। নিশ্চয়ই আছে। এমন মন্ত্রতন্ত্র খুঁজলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে যা একবার ফুঁকে দিলে ওসব আর গায়েই লাগবে না।

সম্পর্কে মণি ন্যাড়ার মামা। সুরেনের বড়। বয়সে প্রায় সমবয়সী। একই ক্লাসে পড়ে। মণির সঙ্গে যুক্তি এঁটে ন্যাড়া খোঁজাখুঁজি করতে লেগে যায়। যেমন ক'রেই হোক মার-নিবারণ মন্ত্র পেতে হবে।

বাড়িঘর তোলপাড় করে শেষে একদিন একটা পুরনো বাক্সতোরং হাঁটকাতে-হাঁটকাতে সেই মহামূল্য জিনিসটা মিলে গেল।

এক ছেঁড়াখোঁড়া পুঁথি। 'সংসার-কোষ'। তাতে লেখা রয়েছে এক আশ্চর্য মন্ত্র : 'ওঁ হ্রীং হ্যাং হ্যাং রক্ষ রক্ষ স্বাহা।'

বড়দের শাসন, পণ্ডিতদের কোপ থেকে শুরু করে জলে জঙ্গলের ভয়—যে কোনো বিপদেই পড়ো না কেন, এই মন্ত্রটা ফুঁকে দিতে পারলে—তোমাকে আর পায় কে !

ব্যস্‌! আর কী চাই। সঙ্গে-সঙ্গে সাঙ্গোপাঙ্গদের মন্ত্রটা শিখিয়ে দেওয়া হল।

ডানপিটের দলটা যেন হাতে স্বর্গ পেয়ে গেল।

কান্না-হাসি বেদনা-আনন্দের ভেতর দিয়ে দিনগুলো এমনিভাবে কেটে যায়।

ছাত্রবৃত্তি পাশ করে ন্যাড়া তারপর ভর্তি হল টি. এন. জুবিলী কলেজিয়েট স্কুলে।

অঘোরনাথের ছেলে সুরেন আর গিরীন থাকত বাবার কাছে মালদহের চাঁচলে। স্কুলের ছুটির কদিন তারা ভাগলপুরে এসে কাটিয়ে যেত। অঘোরনাথ ছিলেন চাঁচলের রাজ-এস্টেটের ম্যানেজার।

ভাগলপুরে থাকার সময় সুরেন আর গিরীন দুজনেই হত ন্যাড়ার সাকরেদ। ন্যাড়ার মা ভুবনমোহিনী দেবী ছিলেন তাদের মেজদিদি। কাজেই খেলার সাথী হলে কি হয় তারা সম্পর্কে হত ন্যাড়ার মামা।

মামা-ভাগ্নের এই দলটা কম বড় ছিল না—ভাগ্নে বলতে একা ন্যাড়া ; আর মণি, সুরেন, দেবেন, গিরীন, উপেন—এদের নিয়ে কিশোর মামাবাহিনী। এদের যত আদর-আবদার সবই মেজদিদি ভুবন-মোহিনীর কাছে।

আর ছিলেন ন্যাড়ার বাবা মতিলাল। তাঁর কাছে সকলের সাতখুন মাপ। বড়দের শাস্তির হাত থেকে বাঁচতে হলে বাড়ির ছেলেমেয়েরা তাঁর কাছেই ছুটে আসত।

মতিলালের ছিল শিল্পীর চেহারা। বড়-বড় কোঁকড়া চুল, গোঁফদাড়ি কামানো ভরাট মুখ। চকচকে চোখে কেমন একটা তন্ময়তা। সাহিত্যের প্রায় সব কটা বিভাগেই তাঁর দখল। আর হাত ছিল ছবি আঁকায়। মনে অনেক শখ, অনেক স্বপ্ন—কিন্তু অভাবের সংসারে পূরণ করবার কোনো উপায় নেই। তাই মনের সেই খোরাক মেটাতে হত বই দিয়ে।

অপ্রত্যাশিতভাবে তার সুযোগও এসে গিয়েছিল। ভুবনমোহিনী দেবীর ন-কাকা অমরনাথবাবু তাঁর মারফত ছোট ভায়ের বৌয়ের

কাছে বই পাঠাতেন। মতিবাবু সেই ফাঁকে বইগুলো পড়ে নিতেন।

অস্থির স্বভাব আর গভীর সাহিত্যানুরাগের জন্যে মতিলাল জীবনে কম দুঃখ পাননি। রুজিরোজগারের প্রতি এই উদাসীনতার পেছনে রয়েছে শিল্পীমনের স্বাধীনতাপ্রিয়তা—ভুবনমোহিনী দেবী তা বুঝতেন। কিন্তু তাহলেও, লোকে পাছে তাঁর স্বামীকে খোঁটা দেয়, পাছে আড়ালে কিছু বলে, এই ভয়েই তিনি কাঁটা হয়ে থাকতেন।

এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে মাঝে-মাঝে কথাও হত। মতিলাল বলতেন, 'সংসারে থাকতে গেলে রোজগার করা দরকার, তা জানি। তবু সত্যি করে বলো তো, আমার একাজের কি কোন দামই নেই ?'

'দাম নেই, একথা কেউ বলছে না। তবে তোমরাই তো বলো, এ জগতে টাকা ছাড়া এক পাও চলার উপায় নেই। যাকগে ওসব কথা। আচ্ছা, ছেলেদের নিয়ে দুবেলা একটু বসলে তো পারো। ওদের পড়া-টড়াগুলো—'

'পড়াতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তাই বলে শুধু পড়া নয়; পড়া আর খেলা—দুটোকে মেলাতে হবে। ছেলেদের মুখে হাসি দেখতে না পেলে আমি হাঁপিয়ে উঠি। ওরা ঠিক চারাগাছের মতো। চারপাশে বেড়া দিতে হয়, কিন্তু রাখতে হয় খোলা আলো-হাওয়ার মধ্যে। তবেই ওরা ডিগ্‌-ডিগ্‌ করে বেড়ে ওঠে।'

কথা এগোয় না। স্বপ্নভরা চোখে মতিলাল ততক্ষণে আবার বইয়ের মধ্যেই ডুব দেন।

দাদামশায় কেদারনাথের যতই দাপট থাকুক, তাঁর ক্ষুদে দৌহিত্রটির সঙ্গে কিছুতেই তিনি এঁটে উঠতে পারতেন না। ন্যাড়া ছিল পালের গোদা। কিন্তু তার পায়ে যেন হরিণের খুর—এমন সে ছুটতে পারে। কাঠবেড়ালির মতো সুড়ুৎ করে গাছে উঠতে পারে। কাজেই তাকে

ধরতে পারা সহজ ছিল না। ন্যাড়ার সঙ্গীরাই মাঝে থেকে দাদামশায়ের হাতে ধরা পড়ে গিয়ে কিল-চড় খেত।

ন্যাড়ার আবার যত সব সৃষ্টিছাড়া খেলা!

কুকুর-বেড়াল-বেজি-পাখি-ফড়িং-রঙিন মাছ—দিনরাত্তির এই নিয়ে তার খেলা। এদের থাকা-খাওয়ার আলাদা-আলাদা ব্যবস্থা। ছোট মেয়েদের দিয়েও নানা ফাইফরমাশ খাটিয়ে নেওয়া হয়। তবে অমনি-অমনি নয়। শিউলি ফুলের বোঁটার রঙে শাড়ি ছুপিয়ে দিয়ে তাদের এ কাজের মজুরী দেওয়া হয়।

ইস্কুল থেকে ফেরবার সময় ন্যাড়া তার সঙ্গী-সাথীদের ডেকে বলে, 'আজ কিন্তু ভাই, তোমরা বাড়ি ফিরেই আকন্দপাতা আর কচি ঘাস যোগাড় করতে বেরোবে।'

একজন হয়তো জিগগেস করে, 'ঘাস কেন?'

—'বা রে, কচি ঘাসই যে ফড়িংদের পোলাও। তা বুঝি জানো না?' তারপর উৎসাহের সঙ্গে বলতে থাকে, 'হোক না ওরা আমাদের বন্দী। মাঝে-মাঝে ভালো খাবার তো দিতে হবে বাপু। ছুনী কেমন ওদের আলাদা-আলাদা বাক্সে রেখেছে—রাজা-ফড়িং, গাধা-ফড়িং, গঙ্গা-ফড়িং, কেরানী-ফড়িং—যে যেমন যুগ্যির, তার তেমন ব্যবস্থা ওর কাছে। দেখিসনি?'

তাহলে তো যোগাড় করতেই হয় ঘাসের পোলাও!

মণিমামা বলল, 'বুড়ো কোকিলটা যে কদিন থেকে পেঁচার মতো মুখ হাঁড়ি করে বসে আছে, একটু কিক-কুক করছে না।'

ন্যাড়া সব শুনে-টুনে বিধান দিল: 'কচি আমপাতার রসের সঙ্গে খানিকটা মরিচগুঁড়ো মিশিয়ে ওর গলায় ঢেলে দিস। কোকিলের দেহে ওটা ঠিক আদার রসের মতো কাজ করবে। দেখিসনি সেদিন চন্দরবাবুর বাড়িতে? আদার রস আর মরিচের গুঁড়োয় বাঈজীর গলা কি রকম খুলেছিল?'

কিসের একটা ছুটি সেদিন। পড়ার ঘরে বসে-বসে ন্যাড়া ম্যাপ আঁকছে। হাতের কাছে আঁকবার নানা সরঞ্জাম। হলুদ, পুঁইবিটুলি, সিমপাতা, বেগনে ফুল, সিঁদুর, নীল বড়ি।

হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল ন্যাড়ার সহপাঠী মণিমামা। অভিযোগের সুরে বলল, 'তোমার ব্যবস্থা মতো কবিরাজি করা হয়েছিল। কিন্তু বুড়ো কোকিলটা এই মাত্তর মারা গেল।'

বিচক্ষণ কবিরাজের মতোই তাড়াতাড়ি আত্মপক্ষ সমর্থন করে ন্যাড়া জবাব দিল, 'তা দেখ বাপু, আমি তো ওকে বাঁচাবার জন্যেই ওষুধ দিয়েছিলাম। এখন ওর যদি আয়ু ফুরিয়ে থাকে, আমি কী করতে পারি বলো? যাও—ওঁ হ্রীং হ্যুং বলে ওর আত্মার সদ্গতি করে এসো।' ব'লে ন্যাড়া আবার রঙ-রেখার মধ্যে ডুবে গেল।

মণি চলে যাবার খানিক পরে ঘরে ঢুকলেন ভুবনমোহিনী। ন্যাড়াকে একমনে কাগজের ওপর রঙ বুলোতে দেখে তিনি বললেন, 'খোকা, তুইও কি জীবনটা শুধু এই করেই কাটিয়ে দিবি? বসে-বসে ছবি আঁকছিস, একটু পড়াশুনোয় মন দিবি না?'

ন্যাড়া বলে, 'বা-রে, এটা তো ইস্কুলেরই কাজ, মা। ছবি কে বলল? দেখছো না ম্যাপ আঁকছি।'

'কী জানি, বাবা। আমার বড্ড ভয় হয়।'

ন্যাড়া ঠিক তার বাপের স্বভাব পাচ্ছে। এখন থেকেই রঙ-তুলির ওপর যা টান, তাতে বড় হয়ে সেও হয়তো আর সব ভুলে গিয়ে বসে-বসে শুধু ছবিই আঁকবে।

ভুবনমোহিনীর সব সময় ভয় ডানপিটে ছেলেটা কখন যে কোন বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়ে। ওর যে ভয় ডর বলে কিছু নেই। নইলে সেবার নয়নার সঙ্গে ছিপ কিনতে গিয়ে কী গেরোই না বাধিয়েছিল।

মতিলালকে এ সম্বন্ধে বললে উনি ওসব কানেই তোলেন না। বলেন, 'তুমি মিথ্যে ভয় করছ, বৌ। এমনি করেই তো ওর সাহস বাড়বে।'

কিন্তু মায়ের মন মানবে কেন? ভুবনমোহিনী বলেন, 'কাজ নেই আমার অমন সাহসে।'

মতিলাল বুঝিয়ে বলেন, 'ও তো আর তোমার বোকা-হাবা ছেলে নয়। দেখলে না কত কম পড়েও কিভাবে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাশ করে গেল। বড় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখে নিও ওই ছেলেই তোমার দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। কিছু ভেবো না তুমি।'

কথার ভেতর দিয়ে মতিলাল এমন নিখুঁতভাবে ভবিষ্যতের ছবি ফুটিয়ে তোলেন যে খানিকক্ষণ ভুবনমোহিনীর চোখের পলক পড়ে না। তারপর তাড়াতাড়ি খুশির ভাবটা চাপা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলেন, 'থাক, খুব হয়েছে। শুধু-শুধু তুমি আমায় দেরি করিয়ে দিলে। যাই দেখি, ছেলেটা আমার সেই কখন খেয়েছে—'

ন্যাড়া যত দুরন্তই হোক, বাপ-মা দুজনেরই সে চোখের মণি। ন্যাড়াকে ঘিরে তাঁরা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেন।

ততক্ষণে ন্যাড়া আবার রঙ-তুলির মধ্যে ডুবে গেছে। ভুবনমোহিনীর চোখে জল এসে গিয়েছিল: তাড়াতাড়ি পেছন ফিরে চোখে আঁচল দিয়ে চোখ মুছে নিলেন।

ঠিক সেই সময় হাতে বই নিয়ে সশব্দে ঘরে ঢুকলেন গাঙ্গুলি-বাড়ির ন-কর্তা অমরনাথ। এ-বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরা তাঁর ভারি ন্যাওটা। তাঁর কাছেই তাদের সব কিছু আদর-আবদার-বায়না।

অমরনাথের হাত থেকে ভুবনমোহিনী বইগুলো দেখতে নিলেন।

চেনা পায়ের শব্দে এক মুহূর্তেই ন্যাড়ার ধ্যান ভেঙে গেল। রঙ-তুলি ফেলে রেখে একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'কই ন-দাদু, আমার লজেঞ্চুস কোথায়?'

পকেট থেকে একমুঠো লজেন্স বার করে অমরনাথ বললেন, 'এই

নাও দাছু, কত খাবে লজেঞ্চুস। কিন্তু আমার ভুবন-মা'র দিকে অমন জুল-জুল করে তাকাচ্ছ কেন? ওসব বই তো তোমার পড়বার কথা নয়। ও যে দীনবন্ধু-মাইকেল-বঙ্কিম…'

একটু হেসে ভুবনমোহিনী কতকটা যেন ছেলের হয়েই জবাব দিলেন, 'ওসব কি আর ওর ছুঁতে বাকি আছে, ন-কাকা? ছোটমা'র ঘরে বসে রোজ রাত্তিরে গল্প না শুনলে ওদের ভাত হজম হয় না।'

ছোটমা মানে কুসুমকামিনী দেবী। গাঙ্গুলি-বাড়ির ছোটগিন্নী। সেযুগের ছাত্রবৃত্তি-পাশ করা মেয়ে। পড়বার বেজায় ঝোঁক ছিল তাঁর। সংসারের কাজকর্ম সেরে তিনি বই নিয়ে বসতেন। বাড়ির ছেলেরা তাঁকে ঘিরে বসে গল্প শুনত। গল্পের এই আসর বসত রাত্তিরে। বাড়ির আর কেউ বড় একটা টের পেত না।

ভুবনমোহিনীর জবাব শুনে অমরনাথ হেসে বললেন, 'কিন্তু এসব আবার এবাড়ির নিয়ম নয়। জানতে পারলে হৈ হল্লা বেধে যাবে। এবাড়ির একমাত্র কথা শুধু—উকিল হও আর পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করো।'

৩

চণ্ডীমণ্ডপে বড়কর্তা কেদারনাথের তত্ত্বাবধানে ছেলেদের সান্ধ্য পাঠচক্র বসেছে। কেদারনাথকে সবাই ভয় করে।

তক্তাপোশের ওপর ফরসা চাদর পাতা। পিলসুজের ওপর জ্বলছে পিদিম। একপাশে আরামকেদারায় ব'সে কেদারনাথ। তাঁর হাতে 'বঙ্গবাসী পত্রিকা'।

ছেলের দল বিরসবদনে পড়ছে :

'...ডান্স লিট্‌ল্ বেবি, এণ্ড মাদার উইল সিং

মেরিলি, মেরিলি ডিং-ডং-ডিং...'

ততক্ষণে কেদারনাথের হাত থেকে খসে গিয়ে খবরের কাগজটা মাটিতে লুটোচ্ছে আর সেইসঙ্গে নাকডাকার একটা প্রবল আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

হঠাৎ পড়া বন্ধ করে ন্যাড়া উঠে পড়ল। তারপর পা টিপে-টিপে কেদারনাথের নাকের কাছে গিয়ে কান পেতে ভালো করে দেখে নিল ঘুমটা যথেষ্ট গভীর হয়েছে কিনা। নাকের কাছে গিয়ে ন্যাড়া যখন বুঝল এ ঘুম সহজে ভাঙবার নয়, তখন সে ভারি খুশি হল। লাফিয়ে উঠে বলল, 'ক্যাট ইজ স্লেপ্‌ট্, লেট মাইস্ প্লে।'

যে কথা সেই কাজ। ঘরের কোণে ছিল দুটো বাখারির তরোয়াল। দেখতে না দেখতে তার একটি ন্যাড়ার এবং অন্যটি তার মণিমামার হাতে উঠল। ঘরের মধ্যে শুরু হয়ে গেল তাণ্ডব নৃত্য! আর সেই সঙ্গে গান : 'মেরিলি, মেরিলি, ডিং-ডং-ডিং...'। তরোয়াল ঘোরাতে ঘোরাতে ন্যাড়া ঘুরে-ঘুরে তেহাই দেয়, 'খুশিসে, খুশিসে, তাক্ ধিনা ধিন।' দলের বাকি সবাই ফুর্তিতে হাততালি দেয়। কিন্তু এইভাবে

চলতে-চলতে তরোয়াল ছুটো কখন যে হাত ফস্কে তেলসুদ্ধ্ পিদিমটা উল্টে দেয়, তা কেউ ঠাহর করতে পারে না। অমনি ছুই যোদ্ধা আর পেছনে-পেছনে তার দলবল ঘর থেকে হাওয়া।

অন্ধকারে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে কেদারনাথ চীৎকার করে উঠলেন: 'মুশাই, এ মুশাই।'

মুশাই ছুটে এল।—'জী, সরকার।'

'ঘর আন্ধেরা কিঁউ? লেড়কালোগ সব কিধার গিয়া?'

মুশাই তাড়াতাড়ি ঘরে বাতি এনে বলল, 'সবকোই খানে গিয়া, হুজুর। ইধার দেবীন বাত্তি উলট্ দিয়া।···আরে, ই দেবীন, উঠ্। শো রাহা কেঁও?'

তেল পড়ে শাদা চাদরটার অনেকখানি জায়গা ভিজে জবজবে হয়ে আছে। তার একপাশে অঘোরে ঘুমোচ্ছে বেচারা দেবেন।

কেদারনাথ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে কানছুটো ধরে দেবেনকে ঘুম থেকে তুললেন। তারপর খড়মে খট্-খট্ আওয়াজ তুলে তাকে টেনে নিয়ে চললেন খাবারঘরের দিকে।

ছেলেরা সত্যিই খেতে ব্যস্ত। কেদারনাথ একবার সবাইকে চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়ে সশব্দে নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'হুঁ, এই হতভাগাই দেখছি তাহলে সমস্ত অনাছিষ্টির মূল। মুশাই, ইস্‌কো আজ কোচোয়ানকা ঘরমে বন্ধ্ রাখো।'

'মুশাই, মুশাই···দরবাজা খোল দো। মুশাই···'—কোচোয়ানের ঘর থেকে বন্দীর আর্তনাদ ভেসে আসছিল।

একটি ছায়ামূর্তি সেদিকে এগিয়ে গেল। তারপর ফিসফিস করে একটা আওয়াজ—'দেবীন ··'

বন্দীর উৎকর্ণ গলা শোনা গেল, 'কে? চাটুয্যে মশাই?'

মতিলাল বললেন, 'হ্যাঁ! চুপ—চেঁচামেচি করিসনে। এগিয়ে আয় জানলার কাছে। এই কলাগুলো খেয়ে নে তাড়াতাড়ি। উঁহু, ওদিকে নয়, এইদিকে। খেয়ে খোসাগুলো আমার হাতে দিয়ে দে। নইলে টের পেলে তোকে আস্ত রাখবে না।'

খানিক পরে মতিলাল অন্ধকারে দ্রুতপায়ে মিলিয়ে গেলেন।

তারপরই ন্যাড়ার দল এসে হাজির হল।

ওদের সাড়া পেয়ে দেবীন আর চোখের জল ধরে রাখতে পারলে না। অভিমান করে বলল, 'বেশ আছিস তোরা। নিজেরা বাতি উল্টে দিলি! আর মাঝের থেকে বিনাদোষে আমি ধরা পড়ে গেলাম। এখন সারারাত এখানে বন্ধ থাকতে হবে।' বলতে-বলতে কেঁদেই ফেলল।

ন্যাড়া সান্ত্বনা দেয়: 'কাঁদিস্‌নে দেবীন মামা, কাঁদিস্‌নে। কপালে গেরো ছিল, কী করবি বল্? আজ রাতটুকু—ওঁ হ্রীং হ্যাং রক্ষ রক্ষ স্বাহা—বলে কোনোরকমে কাটিয়ে দে, কাল দেখবি সব ঠিক হয়ে গেছে।'

দেবীন অনুযোগ করে, 'বড্ড মশা যে—'

ন্যাড়া বলে, 'হোক গে। কালকে তোকে সঙ্গে নিয়ে ঘুড়ির যা প্যাঁচ খেলব।'

'লাটাই ধরতে দেবে?'

'নিশ্চয়। তুই ধরবি লাটাই আর আমি এমন হেঁচকা টান দেবো যে রাজুর ঘুড়ি ঘচাং হয়ে যাবে।'

বন্দীদশার মধ্যেও এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেবীনের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলে।

রামরতন মজুমদার ছিলেন ভাগলপুরের একজন ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। সম্ভ্রান্ত প্রতিপত্তিশালী স্বাধীনচেতা পুরুষ। চাকরি থেকে অবসর নেবার পর আদমপুর অঞ্চলে গঙ্গার ধারে একটা পোড়ো নীলকুঠি কিনে সেখানে প্রকাণ্ড ইমারত তুললেন।

এমনকি সে যুগেও মজুমদার-পরিবারে কোনো রক্ষণশীলতার ছাপ ছিল না।

বেশভূষায় তিনি ছিলেন পুরোপুরি আধুনিক। ধুতির বদলে প্যাণ্ট। পায়ে মোজা। মুখে ছাঁটা দাড়ি। ক্লাবে, টিপার্টিতে তিনি অভ্যস্ত। চিন্তায় দার্শনিক। বাচনভঙ্গিতে ব্রাহ্মসমাজের ছাপ।

রামরতনবাবুর ছেলে রাজেন একেবারেই আলাদা জাতের মানুষ। শ্যামলকান্তি সুস্থ সবল চেহারা। আজানুলম্বিত বাহু। মুখে সামান্য বসন্তের দাগ। ভয় কাকে বলে জানে না। ভ্রূক্ষেপ করে না কাউকে। কোনোরকম কুসংস্কার নেই তার। গায়ে যেমন শক্তি, মনে তেমনি সাহস। কোনো অবস্থাতেই ঘাবড়ায় না।

ন্যাড়ার চেয়ে রাজেন মাত্র বছর কয়েকের বড়। কিন্তু সেই বয়েস থেকেই ইস্কুলের পড়ার চেয়ে অত্যাচারের প্রতিকার করবার দিকেই তার বেশি ঝোঁক।

আদমপুর অঞ্চলটা সে সময়ে বেশির ভাগই জলে জলাকার হয়ে থাকত। চারপাশে বাবলার বন, পুকুর আর খাল। গঙ্গায় জোয়ার এলে কোথাও ডাঙ্গা বলে কিছু থাকে না। তখন মাঠঘাটের ওপর দিয়ে চলে দুঃসাহসী রাজেনের ডিঙি।

ন্যাড়ার দল চায় দুরন্তপনায় রাজেনের মতো হতে। কিন্তু তার আগে অমনি পালোয়ানের মতো শরীর চাই। চাই কুস্তির আখড়া। প্যারালাল বার।

কিন্তু বাধা অনেক। সব চেয়ে বড় বাধা কেদারনাথ। কাজেই গোপন জায়গা বাছতে হবে।

খুঁজেপেতে একটা নিরিবিলি জায়গা পাওয়া গেল। গঙ্গার পাড়ে

ঘোষেদের পোড়ো বাগানবাড়ি। ভেতরে প্রকাণ্ড উঠোন। লোকে বলে 'ভুতুড়ে-বাড়ি।'

ন্যাড়া ওসব আমল দেয় না। বলে, 'ভুত তো হয়েছে কি! আমাদের তো হ্রীং হ্যাং মন্তর জানা আছে।'

সন্ধ্যের অন্ধকারে বাঁশ কাটতে হবে। লোকে যাতে জানতে না পারে।

ন্যাড়া গঙ্গার ধারে একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। সন্ধ্যে হতে দেরি নেই।

হঠাৎ পায়ের শব্দে তাকিয়ে দেখল সুরেন মামা। ন্যাড়াকে দেখে জিগগেস্ করল, 'এতক্ষণ তুমি এখানে ছিলে?'

'না। তপোবনে।'

'তপোবন! সে আবার কোথায়?'

'সে ভারি চমৎকার জায়গা। সকলে খবর রাখে না। তবে যা সাপ, ভেতরে ঢোকা মুশকিল।'

'জায়গাটা আমাকে দেখাবে?'—সুরেন সাগ্রহে জিগগেস করে।

'না। ও জায়গা কাউকে আমি দেখাই না।'

'দেখাও না, বাবা। কাউকে আমি বলব না।'

অনেক সাধ্যসাধনার পর ন্যাড়া রাজী হয়। যেতে-যেতে বলে, 'আচ্ছা, দেখাচ্ছি। কিন্তু কক্ষনো যেন একলা যাসনে, এই বলে দিলাম। জায়গাটায় সাপের আড়ত।'

ঘোষেদের পোড়ো বাড়ির উত্তর দিকে গঙ্গার ধার-ঘেঁষা ঘরটার পেছনে নিম-কামরাঙা-গোলঞ্চ-মদনাকাঁটার ঝুপিতে যে জায়গাটা আবছা হয়ে আছে, তার ভেতর দিয়ে সাবধানে পা টিপে-টিপে যেতে হয়।

ন্যাড়া বলে চলে, 'সবুজ ঝোপের ভেতরটা পরিষ্কার করে বড় একটা পাথর বসিয়ে রেখেছি। পাথরটার ওপর বসে গঙ্গা দেখতে কী ভালো

যে লাগে। ঝিরঝির করে বাতাস বয়। পাতার ফাঁক দিয়ে চিকচিক করে রোদ্দুর। গেলে আর ফিরে আসতে ইচ্ছে করে না।'

বলতে-বলতে ন্যাড়া স্তব্ধ হয়ে যায়।

হঠাৎ ন্যাড়ার হাত ধরে সুরেন বলে, 'চলো, ফিরেই যাই।'

দামী থাপ্পা লাটাইয়ের খর্‌রা মাঞ্জা-দেওয়া সুতোয় পাকা হাতের টান পড়তেই প্রকাণ্ড শাদা ঘুড়িটা বোঁ-বোঁ শব্দে ছুটে গেল গোলাপী ডোরিদার একটা ঘুড়ির দিকে।

তারপর আকাশের গায়ে যেন একটা অঘটন ঘটে গেল। দেখা গেল প্রকাণ্ড শাদা ঘুড়িটা কেটে গেছে। ছোট-ছোট ছেলেদের জয়োল্লাসে মাঠ ফেটে পড়ছে।

গর্বে ন্যাড়ার মাটিতে যেন পা পড়ে না। কিন্তু হঠাৎ একটা দৃশ্য চোখে পড়তেই তার মুখের ভাব বদ্‌লে গেল। প্যাঁচ খেলে হেরে গিয়ে রাজেন তার অমন সুন্দর লাটাইটা গঙ্গার জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। লাটাইটা দেবীনকে ধরতে বলে ন্যাড়া তক্ষুণি ছুটল রাজেনের কাছে।

'লাটাইটা জলে ফেলে দিলে?'

'হ্যাঁ। ওটা কোনো কাজের নয়। তাছাড়া ঘুড়ি আর আমি ওড়াবো না।'

জয়ের আনন্দের বদলে ন্যাড়ার সত্যি ভারি দুঃখ হল। রাজেনকে সে হারিয়ে সুখ পেতে চেয়েছিল, কিন্তু তাই বলে দুঃখ দিতে চায়নি। রাজেন যে তার স্বপ্নের নায়ক।

ন্যাড়া এতদিন যে কথাটা বলি-বলি করেও মুখ ফুটে বলতে পারেনি, এই প্রথম রাজেনকে সামনে পেয়ে সে না বলে পারল না, 'তুমি আমাকে তোমার দলে নেবে, রাজুদা?'

রাজেনও যেন এতদিন মনে-মনে তাই চাইছিল। বলল, 'তুই আসবি সত্যি ?'

'সত্যি আসব। কিন্তু তোমাকে ধরব কেমন করে? কোথায় পাবো ?'

'সন্ধ্যেবেলায় যখন আমি আমবাগানে বাঁশি বাজাবো—'

'অন্ধকারে তুমি বুঝি রোজ বাঁশি বাজাও ?'

৪

আকাশে. মেঘের ঘনঘটা। গঙ্গার থৈ-থৈ জল যেন শিউরে-শিউরে উঠছে। পাল গুটিয়ে শেষ খেয়া ডিঙি নোঙর করছে পাটনী মাঝি।

আমবাগানে ঘনায়মান অন্ধকারে করুণ আশাবরী সুরে হঠাৎ বাঁশি বেজে উঠল।

বৈঠকখানায় বুড়োর দল আড্ডায় বসেছে। একজন বিরক্ত হয়ে বলল, 'এই ভর সন্ধ্যেবেলা আবার বাঁশি বাজায় কে?'

'কে আবার? মজুমদারদের সেই দস্যি ছেলেটা।'

ন্যাড়া তখন ভাবছে কোথা দিয়ে যাওয়া যায়। খিড়কির দুয়োরের ঘাটে মেয়েদের বাসন মাজার পাট এখনও চোকেনি। ওদিক দিয়ে গেলেই দেখে ফেলবে।

'মণিমামা, শিগগির এসো তো একবার।'

কোনো কথা নয়। মণিকে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াতে হল। তার কাঁধে পা তুলে দিয়ে ন্যাড়া পাঁচিলের মাথায় উঠল। ওপারে একরাশ খোলা-খাপরা। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

পাদুটো ঝুলিয়ে ন্যাড়া লাফ দিল। আর সঙ্গে-সঙ্গে ন্যাড়ার চীৎকার: 'ও মণিমামা গো, সাপে বুঝি ছুবলে দিল পায়ে।'

চীৎকার শুনে আলো নিয়ে সারা বাড়ি ছুটে এল। ধরাধরি করে ন্যাড়াকে উঠোনে আনা হল। তার আগেই মণি তার পৈতেটা ছিঁড়ে ন্যাড়ার পায়ে খুব ক'ষে বাঁধন লাগিয়েছে।

ভুবনমোহিনী ডুকরে কেঁদে উঠলেন। মতিলাল এগিয়ে আসছিলেন, তাঁকে আটকানো হল। এসব দায়দায়িত্বের ব্যাপারে তাঁর বুদ্ধি পরামর্শের ওপর কেউ কোনোরকম ভরসা রাখে না।

ন্যাড়ার পায়ে আরও কয়েকটা বাঁধন পড়ল।

'সরো দেখি, তোমরা'—কেদারনাথ ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন। ন্যাড়া তখন ভুবনমোহিনীর কোলে মাথা দিয়ে নিস্তেজ হয়ে শুয়ে আছে।

'দেখ তো খেয়ে এটা কী ?'

ন্যাড়া জিভটা খানিক নাড়িয়ে জবাব দেয়, 'চিনি।'

'বটে। আচ্ছা, এটা ?'

মুখ কুঁচকে ন্যাড়া বলে, 'নুন।'

ভুবনমোহিনী এবার ভেঙে পড়লেন। ন্যাড়া নুনকে বলছে চিনি, চিনিকে বলছে নুন। কালসাপে কামড়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

মতিলাল এককোণে দাঁড়িয়ে। দুচোখে তাঁর জলের ধারা।

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে রাজেন এসে হাজির। মতিলালকে জিগগেস করল,'কী হয়েছে, চাটুয্যেমশাই ? ন্যাড়া কোথায় ?'

'তাকে কালে কেটেছে, বাবা। দেখোগে ঐ দিকে।'

'মায়াগঞ্জে খুব ভালো রোজা আছে। নিয়ে আসব ?'

'এই রাত্রে তুমি কি যেতে পারবে, বাবা ? সে যে অনেকটা দূর।'

'আপনি ভাববেন না। আমি যাবো আর আসব। আমার ডিঙি আছে। যাবো স্রোতে, আসবো পাল তুলে।'

ছুটে বেরিয়ে গেল রাজেন।

এদিকে চলতে লাগল সম্ভাব্য সবরকম তুকতাক। সর্প-সঙ্কটার উদ্দেশে ক্রন্দমান প্রার্থনা। ভুবনমোহিনী কাঁদছেন: 'হে মাগো, হে মা মনসা! তোমায় ষোড়শোপচারে পুজো দেবো, ডাইনে-বাঁয়ে চিনির নৈবিদ্যি দেবো, বুক চিরে রক্ত দেবো। দোহাই মা, এই আমার অন্ধের নড়ি, পিদিমের সলতে, দুঃখীর ক্ষুদকুঁড়োটিকে তুমি ফিরিয়ে দাও মা।'

ওদিকে তীরবেগে সারা পথ বেয়ে রাজেনের ডিঙি ভিড়ল মায়াগঞ্জের ঘাটে। তারপর এক ছুটে ওঝার বাড়ি।

এই দুর্যোগে এতটা রাস্তা যেতে হবে শুনে ওঝা গাঁইগুঁই করে। বলে, 'এত রাত্তিরে···তা আমি, হাঁ এখেন থেকেই গেঁটেল করে দেলম বাবু। ওঁয়ার কালনাগিনীর বাপের সাধ্যি নি আর সারা রাত্তির কিছু কত্তি পারে রুগীকে।'

হঠাৎ রাজেনের মুখচোখের ভাব বদলে গেল। চোখে আগুন ঠিকরিয়ে বলল, 'আমার নাম রাজু, নামটা হয়তো শুনে থাকবে—'

ওঝা কুঁচকে উঠল ভয়ে।

সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল: 'আহ্‌হা! আমি কি বল্লম যাবোনি? তা চলো না, বাবু—শুধু বলছেলম বলি···'

কদিন পরে।

আলো-আঁধারি সন্ধ্যায় রাজেন আর ন্যাড়া গঙ্গার পাড়ে বসে গল্প করছে। ন্যাড়াকে সাপে কাটা আর ধমকে ওঝা আনার গল্প।

ন্যাড়া বলছিল, 'তুমি রাজুদা বাঁচালে বাঁচি, মরতে বললে মরি।'

'বটে! চল্ তবে—'

'কোথায়?'

'গঙ্গায়। সাঁতার কাটতে।'

দুজনে ঝাঁপ দিল গঙ্গায়। একটানা বহুদূর সাঁতার কেটে মেছোঘাটায় গিয়ে উঠল। সার-সার জেলে ডিঙির ছইয়ের ওপর গাছের পাতার ভেতর দিয়ে চুইয়ে-চুইয়ে পড়ছে জ্যোৎস্না। গলুইয়ের ভেতর খলবল করছে মাছ। পাটাতনের ওপর বসে টিমটিমে আলোয় একজন তুলসীদাসের দোঁহা গাইছে:

আরে, রমন রমন রামা, সীয়াবর রামজীনে
রামা হো রামা হি রামা রাম।

অব তুলসীদাসজী পহুঁ কহথেঁঈ সন্‌সারে
কী রাম ছোড়ি নেহি কুছু কাম॥

শ্রোতার দল মশগুল হয়ে শুনছে। একজন বলে উঠল, 'হাঁ হাঁ, ঠীক বোলা—রাম ছোড়ি নেহি কুছু কাম।'

'ঠীক। পাপ সন্‌সারমে ঈত বঢ়ী পুনকী বাত—কা হো ছেদীলাল?'

রাজেন আর ন্যাড়া তখন ছেদীলালের মাছসুদ্ধ ফাঁকা ডিঙির ঠিক পেছনে। কাছিটা ছুরি দিয়ে কেটে ডিঙির ওপর ঝপাং করে উঠে বসল রাজেন আর ন্যাড়া। জেলের দল টের পেতে-পেতে ওরা প্রায় তখন মাঝ দরিয়ায়।

গঙ্গার এপার-ওপার জুড়ে তখন হাঁক উঠেছে: 'হো-হো, ডাকু-ডাকু, আরে-রে-রে, ভাগা-ভাগা…'

পেছনে ধাওয়া করল তীরবেগে কয়েকটা ডিঙি। রাজেন চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে নজর রাখছে। যাতে কোনোদিক থেকে ওরা আচমকা না এসে পড়ে!

হঠাৎ রাজেন বলে উঠল, 'ন্যাড়া, ডিঙিটা শিগগির শরবনের দিকে ভিড়িয়ে দে। চটপট। ওরা এসে পড়ল।'

একটা ডিঙি সাঁ করে ভিড়ল সেইদিকে। ন্যাড়া ডাকল, 'রাজুদা, রাজুদা—'

রাজেন ততক্ষণে বৈঠাটা উঁচিয়েছে। একটা শব্দ হল। তারপরই একটা আর্তনাদ: 'আরে—এ-এ, রাম কহো! মার ডালা—আঁ বাঁপ!' ঝুপ করে একটা শব্দ হল গঙ্গার জলে।

তারপর অনেকখানি রাস্তা গিয়ে খাড়ি। খাড়ির মধ্যে যখন নৌকো ভিড়ল তখনও দূর থেকে আওয়াজ ভেসে আসছে…'ভাগা ভাগা, দূর ভাগা হ্যায়।'

রাত ফরসা হয়ে আসছে।

মেছোহাটায় পাইকারের দল ঝুড়ি নিয়ে বসে। রাজেন আর ন্যাড়া এমনভাবে পোশাক বদলেছে যে, চেনা যায় না।

মাছ দিয়ে রাজেন টাকাগুলো গুণে নেয়।

অতগুলো টাকা দেখে ন্যাড়ার চোখ বড়-বড় হয়। 'অত টাকা দিয়ে কী হবে ?'

'কিচ্ছু না,' বলে রাজেন বাউরীপাড়ার দিকে চলতে লাগল।

ভাঙা কুঁড়েঘরগুলোর সামনে একদল ছেলেমেয়ে। দেখলেই বোঝা যায় কদিন ধরে পেটে ভাত নেই।

রাজেনকে দেখে তারা কলকলিয়ে উঠল।

রাজেন ধমক দিল, 'অ্যাই চুপ!' তারপর সমস্ত টাকা পয়সাগুলো ওদের হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'সবাই ভাগ করে নিবি। পরে যেন কোনো নালিশ না শুনি। আর দ্যাখ্, এই শেষ। এবার থেকে নিজেদের অন্ন নিজেরা যোগাড় করে নিবি, বুঝলি ?'

তারপর ন্যাড়ার হাত ধরে হন-হন করে এগিয়ে গেল রাজেন।

যেতে-যেতে বলল, 'সত্যিই ওরা বড্ড দুঃখী। এ সময়টা ঘরে কিছুই থাকে না। মাঠঘাটেও কাজ নেই। ওদের সব চেয়ে বড় দোষ—লোকের কাছে হাত পাতবে, কিছুতেই হাত মুচড়ে কেড়ে নেবে না। তিলে-তিলে মরেও তাই।'

ন্যাড়া কী যেন বলতে যাচ্ছিল। রাজেন তাকে বাধা দিয়ে বলল: 'আগে শরীরটা তৈরি কর, ন্যাড়া। নইলে মানুষের এই দুখ্যু ঘোচানো যাবে না।'

৫

গাঙ্গুলীবাড়ির ছাদের ওপর মেয়ের দল সার বেঁধে বসেছে সার্কাস দেখতে।

ন্যাড়ার দল দেখাবে সার্কাস।

কেদারনাথ বাড়িতে নেই। অঘোরনাথ বাইরে। বাড়িতে গুরুজন বলতে মতিলাল। মতিলালকে রাজী করানো শক্ত নয়।

সুতরাং ন্যাড়া আর তার মণিমামা ভেলভেটের প্যান্ট পরে আর মাথায় পাখির পালক গুঁজে সার্কাস দেখাবার জন্যে তৈরি।

পাশে ঘোষেদের পোড়োবাড়ির উঠোনে খেলা দেখানো হচ্ছে। ন্যাড়া একটা খচ্চরের পিঠে চড়ে এসে উঠোনটায় একবার পাক খেল। তারপর মাটিতে লাফ দিয়ে নেমে ক্লাউনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে একটা হাত মেলে দিয়ে বলল, 'নাউ, লেডিজ এণ্ড জেণ্টলমেন, আমাদের খেলা এবার শুরু হবে—'

চারদিক থেকে ঘন-ঘন হাততালি পড়ল। ছাদের ওপর বসে মেয়েরা হাসছে।

এমন সময় মণি একটু কান খাড়া করে থেকে বলে উঠল, 'এই সেরেছে, ঘোড়ার খুরের শব্দ। বাবা বোধহয় আসছেন।'

সুরেন, দেবীন—ওরা সবাই মন্ত্র ফুঁকতে লাগল: 'ওঁ হ্রীং হ্যাং হ্যাং রক্ষ রক্ষ স্বাহা।'

ছোট দাদুর টমি কুকুর, ভাতুয়ার খচ্চর, রাজেনের শাহাজাদী বাঁদর, সার্কাসের জন্তুজানোয়ারগুলোকে একটু সামলে রাখতে হল।

মন্তরে কাজ হল না। অঘোরনাথ ঘোড়ায় চড়ে বাড়িতে ফিরলেন।

বাড়ির গিন্নিরা ছেলেদের হয়ে তাঁর কাছে দরবারে গেলেন।

অঘোরনাথ ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কী বললে? ওরা "জীবন-নষ্ট" খেলা দেখাবে? তা খেলা কেন? ওদের জীবন নষ্ট হতে আর বাকি কী?'

'ওরা খুব বায়না ধরেছে। যদি তুমি রাজী হও—'

'হুঁ। ন্যাড়া কোথায়?'

'ওই তো খেলা দেখাবে।'

'পড়াশুনো চুলোয় গেল। এখন বেদের দল খুলে বসেছে।'

'পড়াশুনো তো ভালোই করছে ন্যাড়া।'

'হ্যাঁ! ভালো যা করছে—' বলতে-বলতে অঘোরনাথ হন-হন করে ভেতরে ঢুকলেন।

খিড়কির ঘাট।

এদিকে-ওদিকে কতকগুলো বুনো আগাছা, স্তূপাকার খোলা-খাপরা আর শ্যাওলা-ধরা ইঁটপাটকেল। তার মাঝখানে ডালপালা ছড়িয়ে একটা বেয়াড়া পেয়ারা গাছ। নিতান্ত যারা ডানপিটে, তারাই শুধু পেয়ারার লোভে ওদিকে যায়।

দুপুরটা রোদ্দুরের তাপে ঝাঁ-ঝাঁ করছিল।

হাতে একটা লাঠি নিয়ে ইঁটপাটকেলের স্তূপ সরাচ্ছিল ন্যাড়া। খানিকটা তফাতে মাটির হাঁড়ি আর সরা নিয়ে নীলু দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ ফণা তুলে দাঁড়িয়ে উঠল এক গোখরো সাপের বাচ্চা। সঙ্গে-সঙ্গে হাতের লাঠি ফেলে দিয়ে ন্যাড়া হাতখানেক লম্বা একটা বেলের শেকড় সাপটার মাথার ওপর তুলে ধরল। রাগে ফুঁসতে-ফুঁসতে সাপটা বারে-বারে সেই শেকড়টার ওপর ছোবল মারতে লাগল।

নীলু মাটির হাঁড়িটা নিয়ে সাপের দিকে এগিয়ে গেল। ভয়ে তার ঠকঠক করে হাত কাঁপছিল।

এমন সময় কে যেন পেছন থেকে লাঠি দিয়ে এক ঘা বসাতেই সাপের মাথাটা সঙ্গে-সঙ্গে থেঁৎলে গেল।

ন্যাড়া বিরক্ত হয়ে তাকাল। দেখল লাঠি হাতে মণি দাঁড়িয়ে। ন্যাড়া বলল, 'ইস্, কী করলি মণি মামা? সাপটা যে মরে গেল!'

নীলুর হাত এত কাঁপছিল যে, হাঁড়িটা পড়ে গিয়ে ভেঙে ছত্রখান হয়ে গেল।

মণি সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'ভেবেছিলি দুধকলা দিয়ে সাপ পুষবি, না? একবারের কামড়েও শিক্ষা হয়নি?'

ন্যাড়া বলল, 'আমি যে সাপধরা শিখছিলাম।'

মণি কী যেন বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় মুশাইকে সেদিকে হন্তদন্ত হয়ে আসতে দেখে ন্যাড়াকে ইশারা করে চলে যেতে বলে নিজে অন্যদিকে ছুটে পালাল।

ন্যাড়াকে মুশাই দেখে ফেলায় ন্যাড়া আর পালাতে পারল না।

মুশাই ন্যাড়াকে ডাকল, 'এ ন্যাড়াবাবু, চলিয়ে।'

ন্যাড়া নেহাত ভালোমানুষ সেজে বলল, 'কোথায়? কোথায় মুশাই?'

'বড়াবাবু বোলাথেঈঁ।'

'আমাকে!'

'হুঁ-হুঁ। ঔর কিসকো বোলাবে?' বলে টেকো মাথাটা ঘুরিয়ে খোঁচা-খোঁচা গোঁফের ফাঁক দিয়ে মুশাই তার মুখ থেকে খৈনির বিবর্ণ দলাটি মাটিতে ফেলে দিল। ন্যাড়াকে ঢিট করার ব্যাপারে তার হাতও যে নেহাত কম নয়, আকারে-ইঙ্গিতে এই ভাবটাই সে ফুটিয়ে তুলতে চায়।

মুশাইয়ের সঙ্গে ন্যাড়া চলে যেতে নীলু খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আপন মনে বিড়-বিড় করতে লাগল, 'ওঁ হ্রীং হ্যাং হ্যাং রক্ষ রক্ষ স্বাহা...'

ন্যাড়াকে সোজা নিয়ে গিয়ে তোলা হল কেদারনাথের বৈঠকখানায়। ঘরের মধ্যে বসে ইস্কুলের একজন মাস্টারমশাই।

কেদারনাথ রাশভারি গলায় জিগগেস করলেন, 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?'

ন্যাড়া বুঝল আজ কপালে তার বিস্তর দুর্ভোগ। ঘরে-বাইরে তার বিরুদ্ধে কেবলি নালিশ। মাস্টারমশাই এমনি কোনো নালিশ নিয়েই এসেছেন বোধ হয়। কিন্তু ন্যাড়া ঠিক মনে করতে পারে না—দু-চারদিনের মধ্যে ইস্কুলে কোন অন্যায়টা সে করেছে।

ন্যাড়া মাথা নিচু করে থাকে। যে-কোনো শাস্তির জন্যে মনে-মনে তৈরি হয়।

কেদারনাথ স্বাভাবিক গলাতেই বললেন, 'প্রণাম করো মাস্টার-মশাইকে।'

ন্যাড়া একটু অবাক হয়। তাকে গঞ্জনা দিতে কেদারনাথ এত দেরি করছেন কেন ?

প্রণাম করে উঠে দাঁড়াবার পর মাস্টারমশাই সস্নেহে তার মাথায় হাত রাখলেন।

ন্যাড়ার ভারি অস্বস্তি হয়। এত ঢঙ কেন ? মাস্টারমশাই বলেই ফেলুন না—কী অন্যায়টা সে করেছে।

'তুমি ডবল প্রমোশন পেয়েছ, বাবা ; যাও দাদুকে প্রণাম করো।'

দাদুকে প্রণাম করতে গিয়ে ন্যাড়ার মনে হল, যতটা খারাপ সে ভেবেছিল পৃথিবীটা মোটেই ততটা খারাপ নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১

শাস্ত্রে যে-বয়সে পুত্রের সঙ্গে মিত্রের মতো আচরণ করবার নির্দেশ দেওয়া আছে, ন্যাড়ার এখন সেই বয়েস ! গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। সবল ঋজু চেহারা। ভাসা-ভাসা উজ্জ্বল চোখ।

পুত্র-পরিবার নিয়ে মতিলালকে দেবানন্দপুরে ফিরে আসতে হয়েছে। কেদারনাথ কিছুদিনের জন্যে হালিসহরের বাড়িতে গেছেন থাকতে।

হুগলী ব্রাঞ্চ ইস্কুলের সেকেণ্ড ক্লাসে ন্যাড়া পড়ছে। ইস্কুলে যাবার রাস্তায় হঠাৎ ট্যাঁপার সঙ্গে দেখা। সেই যে প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালার সেই সর্দার-পড়ুয়া। কতদিন পরে ট্যাঁপার সঙ্গে দেখা !

ন্যাড়া দাঁড়িয়ে পড়ে জিগগেস করে, 'কিরে ট্যাঁপা, চিনতে পারছিস?'

ট্যাঁপা একটু তাকিয়ে কাঁধের গামছাটা দিয়ে মুখ মুছতে-মুছতে বলল, 'আরে, ন্যাড়া যে !'

'উঃ, তুই কত বড় হয়েছিস !'

ট্যাঁপা বলল, 'তা ভাই, এখন মাথায় ঘরসংসার। নেকাপড়া তো আর হলুনি। বাপ ব্যল্ল—বে কর, খেতখামার ঘ্যাখ। তা শ্বৌরো আমার খুব ভালো নোক মাইরি। এই বলদটা দেলে। ব্যল্লে, শুধু হাতে মেয়েটারে সঁপে দুবো, এটারেও সঙ্গে নে যা কেনে। হাল-খরচাটা তবু যাহোক বাঁচবে আমার মেয়ের।'

শুনে ন্যাড়া হাসে। বলে, 'বেশ, বেশ। তাহলে তো তুই একটা কাজের কাজ করেছিস রে, ট্যাঁপা।'

ট্যাঁপা মুখটা লজ্জা-লজ্জা করে হাসে। তারপর হঠাৎ বলে, 'হ্যাঁ, ভালো কথা। শুনেছিস তো, ধীরুর বে হয়েচে ?'

ন্যাড়া একটু চমকে উঠল। কিছু বলল না।

ট্যাঁপা বলতে লাগল, 'কিন্তু এমনি দুঃখের কপাল মেয়েটার যে, বছর না ঘুরতে বিধবা হল। এখন কাশীতে না কোথায় যেন থাকে।'

ন্যাড়ার মুখ দিয়ে কোনো কথা সরল না।

ট্যাঁপা একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে বলল, 'ওই যে সদাও আসছে, যা তোরা ইস্কুলে যা। যাস কিন্তু একবার আমাদের বাড়ি।'

তারপর বলদটাকে তাড়াতে-তাড়াতে মাঠ ভেঙে ট্যাঁপা এগিয়ে গেল। 'হেট্···ক্যাঁক্···ক্যাঁক্···ক্যাঁ···'

রাত অনেক। চারদিকে ঘুট-ঘুট করছে অন্ধকার। দুর্যোগের রাত্রি। শেয়াল-কুকুরও বাইরে বেরোয়নি।

আকাশে ঝিলিক দিয়ে উঠল বিদ্যুৎ। তার আলোয় সদানন্দের বাড়ির পেছনদিকে একটি ছেলেকে দ্রুতপায়ে যেতে দেখা গেল। ছাদের সঙ্গে একটা মই লাগানো। বোঝা গেল, ঐ মই বেয়েই সে উঠবে। আশে-পাশে আম-জামের ডালপালায় আঁজলা-আঁজলা অন্ধকার।

খানিক পরে ছাদে সদানন্দের গলা শোনা গেল, 'এসো, এসো ন্যাড়াদা, ছক পাতাই রয়েছে।'

কাগজে-ঢাকা হারিকেনের আলোয় দেখা গেল কথাটা মিথ্যে নয়।

'আজ রাত্তিরে দাবাখেলা বন্ধ থাক, সদা। কাজ আছে।'

'এক বাজি হবে না?'

'না রে, আকাশের গতিক ভালো নয়। জিনিসপত্তরগুলো রাতারাতি যোগাড় করে ফেলা দরকার। নইলে রাত পোয়াতেই গাঁয়ের লোকে ওদের ছিঁড়ে খাবে।'

ব্যাপারটা সদানন্দর আগে থেকেই জানা। কাজেই সদানন্দ কোনো প্রশ্ন করল না। শুধু বলল, 'ঠিক আছে। চলো।' তারপর দাবার ছক উঠিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিল।

মই দিয়ে নেমে ন্যাড়া ফিসফিস করে বলল, 'তুই সেই বাগানটাতে যা। তরিতরকারি ফলমূল যা পাবি নিয়ে গড়ের কাছে অপেক্ষা করবি। আমি দেখি পুকুরে যদি মাছ-টাছ পাই। দেখিস্, বোকার মতো যেন ধরা পড়িস্ না। সেই জিনিসটা আছে তো সঙ্গে?'

'তা আর বলতে?' বলে সদানন্দ ফতুয়াটা ওঠাল। বিদ্যুতের আলোয় তার কোমরে খাপশুদ্ধু ছোরাটা চকচক করে উঠল।

তারপর দুজনে দুদিকে চলে গেল।

রাত শেষ হতে আর খুব বেশি দেরি নেই। অন্ধকার পাতলা হয়ে আসছে। কয়েক পশলা বৃষ্টির পর গাছের ভিজে ডালের ভেতর দিয়ে ম্লান চাঁদের আভাস। দু-একটা নিশাচর পাখি শেষবারের মতো ডাকছে।

ন্যাড়া আর সদানন্দ উলুখড়ে ছাওয়া একটি জীর্ণ কুঁড়ে ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। শূন্য দাওয়ার ওপর দুটো ভারি থলি নামিয়ে রেখে কোমরের গামছা খুলে তারা শরীরের ঘাম মুছে নিল।

তারপর ন্যাড়া এগিয়ে গিয়ে দরজার শেকল ধরে নাড়ল।

ভেতর থেকে নারীকণ্ঠে শোনা গেল, 'ওগো শুনচো। বাইরে ডাকচে।'

'এ্যাঁ!' তারপর আবার পাশ ফিরে ঘুম।

'পুরুষ মানুষের এমন ঘুমও তো দেখিনি। বলি, শুনচো? বাইরে কে ডাকচে।'

'আঃ, আচ্ছা জ্বালা তো দেখচি। রাত না পোয়াতেই খাই-খাই! রাত অব্দি লোকের দোরে-দোরে ঘুরেচি, একটা পয়সাও কেউ ধার দিল না। আবার বলে, মেয়ের বিয়েতে না খাওয়ালে একঘরে করবে। করুক। অমন সমাজের মুখে আমি নুড়ো জ্বেলে দেবো।'

'খুলে একবার দেখলেই তো হয় কে ডাকছে।'

'কে আবার ডাকবে? রেড়ো ভাটের দল ছাদা বাঁধতে এয়েচে। বলছ যখন, যাই দেখি।'

দরজাটা খুলেই ভদ্রলোক আলো হাতে নিয়ে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন। ন্যাড়া আর সদানন্দ এত রাত্তিরে তাঁর কাছে কেন? কারো কোনো বিপদ-আপদ ঘটেনি তো?

তাড়াতাড়ি চোখদুটো কচ্‌লে নিয়ে তিনি বললেন, 'একটু দাঁড়াও, বাবা। ভেতর থেকে মাদুরটা নিয়ে আসি।'

'কিচ্ছু দরকার নেই, জ্যাঠামশাই। আমরা এক্ষুণি চলে যাবো। আপনি এই থলি দুটো শুধু ঘরে তুলুন।'

থলি দুটোর দিকে তাঁর এতক্ষণে চোখ পড়ল। একটাতে শাকসব্জি বেরিয়ে আছে, আরেকটা থেকে প্রকাণ্ড একটা মাছের ল্যাজা দেখা যাচ্ছে।

মুখ দিয়ে তাঁর কোনো কথা সরল না। চোখ দিয়ে টস-টস করে জল পড়তে লাগল।

ন্যাড়া লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি বলল, 'দেরি হয়ে গেছে। আমরা আজ যাই, জ্যাঠামশাই।'

প্রৌঢ় ভদ্রলোক চোখ মুছে বললেন, 'তোমাদের কী বলে আশীর্বাদ করব ভেবে পাচ্ছি না। ভগবান তোমাদের বাঁচিয়ে রাখুন। তোমাদের ঋণ আমি এ জীবনে শোধ করতে পারব না। আর একটা কথা। কাল দুপুরে তোমরা এখানে খাবে। আমরা বামুন নই বলে—'

ন্যাড়া তাড়াতাড়ি বলল, 'ও কথা তুলবেন না, জ্যাঠামশাই। কার কী জাত আমরা জানি। আজ যাই, কাল দুপুরে আমরা আসব।'

রাস্তায় এসে ন্যাড়া সদানন্দকে বলে, 'বাড়িতে গিয়েই মইটা সরিয়ে রাখিস কিন্তু। ভুল না হয়। আর দেখিস, যেন ঘুমিয়ে পড়িস নে। বেলা করে উঠলে লোকে ঠিক সন্দেহ করবে। সকাল না হওয়া পর্যন্ত বিছানায় ঘাপটি মেরে পড়ে থাকবি, বুঝলি?'

২

বাড়ির সামনে উঠোনের ঘাসের ওপর মতিলাল পায়চারি করছেন।

সংসারের বোঝা টেনে-টেনে তিনি ক্লান্ত। আস্তে-আস্তে মাথার ওপরটা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। মা চোখ বুজলেন। কেদারনাথ দেহ রেখেছেন ভাটপাড়ায় গুরুগৃহে। অভাবে আর অনটনে মাথার ওপর যেন আকাশ ভেঙে পড়ছে।

এই অভাব ভুলে থাকার একটাই শুধু উপায় আছে। মতিলাল আস্তে-আস্তে ঘরের ভেতরে যান।

সামনে সাজানো রাশীকৃত বই। তা থেকে একটা বই টেনে নিয়ে পকেট থেকে বার করেন সুতো-বাঁধা নিকেলের চশমা।

বইতে চোখ বুলোতে-বুলোতে তাঁর মুখের ভাব সহজ হয়ে আসে। চোখের দৃষ্টিতে একটা সুমধুর স্বপ্ন ভেসে ওঠে। তারপর বই রেখে দিয়ে বইগুলোর আড়াল থেকে একটা খাতা বার করেন।

সামনে দোয়াতের পাশে কলম। অন্যমনস্ক মতিলাল কলমটা কিন্তু কোথাও খুঁজে পাচ্ছেন না। পকেট তন্নতন্ন করে খুঁজছেন। একরাশ ছেঁড়া কাগজের সঙ্গে বেরিয়ে এল একটা ছোট পকেট-হুঁকো। কলমটা পাওয়া গেল না।

কিন্তু হুঁকো পেয়ে মতিলাল হাতে স্বর্গ পেলেন। এতক্ষণে মনে পড়ল যে বহুক্ষণ তাঁর তামাক খাওয়া হয়নি। মতিলাল করুণ চোখে এদিক-ওদিক তাকালেন।

ঠিক সেই সময় কল্কের আগুনে ফুঁ দিতে-দিতে ঘরে এসে ঢুকলেন স্ত্রী ভুবনমোহিনী।

কল্কেটা হুঁকোর মুখে লাগিয়ে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে

তাকিয়ে মতিলাল জোরে-জোরে কয়েকটা টান দিলেন। তারপর হাত দিয়ে ধোঁয়া তাড়াতে-তাড়াতে বললেন, 'আমার যে খুব তামাক খেতে ইচ্ছে হয়েছিল, কেমন করে তুমি জানলে ?'

'এতদিন ঘর করছি, এটুকুও জানবো না ?' তারপর একটু থেমে বললেন, 'একটা কথা বলতে এসেছিলাম তোমাকে। আমি আর পারছি না চালাতে। কিছু না আনলে তো আজ রান্না হবে না।'

মতিলাল ভারি সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন। ভুবনমোহিনীকে কিভাবে সংসার চালাতে হয় তিনি জানেন।

মতিলাল হুঁকোটা সরিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন।

'কার কাছেই বা এখন যাই, হাত পাতার আর জায়গাও যে ছাই নেই'—বলতে-বলতে মতিলালের দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

রেল-রাস্তা বুকে করে প্রকাণ্ড মাঠ। কাছেই আম-জাম-পেয়ারার বাগান। ও পাশে ইস্কুলে যাবার রাস্তাটা দেখা যায়।

পেয়ারাতলায় বসে একটা সরু কাঠি দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটতে-কাটতে ন্যাড়া আকাশ-পাতাল ভাবছে। পায়ের সামনে একটা পেয়ারা পড়তেই ন্যাড়া চমকে মাথা তুলল। গাছের ডালে অসহায় লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে একটা পাখি। পেয়ারাটা তার মুখ থেকেই অসাবধানে পড়ে গেছে।

ঠিক সেই সময় সদানন্দ কোথা থেকে ছুটে এসে ন্যাড়ার পাশে বসে পড়ল।

'ন্যাড়াদা, তুমি ইস্কুলে যাচ্ছো না কেন বলো তো ?'

'ইস্কুলে আর আমি যাবো না।'

'সে কী ! কেন ?'

'সোজা কথা। মাইনে দিতে পারি না। মাইনের জন্যে ইস্কুলে কথা

শুনতে হয়, বাড়িতে মাইনের কথা বললে বকাবকি। বাগানে পেয়ারা খেতে আসি তাতেও রেহাই নেই, মালী তাড়া করে। যেদিকেই যাই সবাই মারমুখো। কপালে কত যে আছে!···যাক গে, ওসব কথা। ওঠ্, ওঠ্, চ দেখে আসি ট্রেণ আসছে।'

লোহার তারের সামনে ন্যাড়া আর সদানন্দ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই ট্রেণ এল এবং তাদের দিকে গরম নিঃশ্বাস ছাড়তে-ছাড়তে বিরাট এক ড্রাগনের মতো ল্যাজ নাড়াতে-নাড়াতে সামনে দিয়ে চলে গেল। ট্রেণটা চোখের আড়ালে চলে যাবার পর ন্যাড়ার হুঁশ হল—লাল সিগন্যাল দেখিয়ে ট্রেণটাকে থামিয়ে দেবার জন্যে বাখারির মাথায় একটা লাল গামছা তো সে বেঁধে রেখেছিল। ইস্, ট্রেণ দেখার উত্তেজনায় দুজনের একজনেরও আর সে কথা মনে ছিল না।

'খোকা—'

ন্যাড়া তখন বাবার পড়ার ঘরে বসে তন্ময় হয়ে বাবার লেখা খাতাগুলো দেখছিল। গল্প-উপন্যাস-নাটক-কবিতা। কিছু বাদ নেই। সব লেখাই অসমাপ্ত। কিন্তু লেখার মধ্যে বাঁধুনি আছে।

মার ডাক কানে যেতেই ভাবলে, আবার কোনো নালিশ নিশ্চয়! তাড়াতাড়ি খাতা বন্ধ করে ন্যাড়া বাড়ির বাইরে চলে গেল।

হাঁটতে-হাঁটতে ন্যাড়া যেখানে এসে পৌঁছুল সেটা একটা আখড়া। বহু বয়সের বহু রকমের মানুষ এখানে। যাযাবরদের জীবন। মন্দ লাগে না, কিছুক্ষণের জন্যে সমস্ত কিছু ভুলে থাকা যায়। এদের সঙ্গে ন্যাড়ার পরিচয় হয়েছে সম্প্রতি।

আখড়াই শুরু হয়ে গেল।

বিরাট গোঁফ চুমরিয়ে বসে আছেন অধিকারীমশাই। আশে-পাশে চুলবুল করছে ছোট বড় 'অ্যাক্টো'-দার। পাখোয়াজ শাণিয়ে নিয়ে

বসেছে বাজনদার—এখুনি ঢুন্‌-চৌদুনে বেজে উঠবে। গান ধরেছে নতুন সাকরেদ। ন্যাড়া।

'এতদিনে ত্রিতাপহরা মা, হয়নি বুঝি তোর মনের মতো···'

অধিকারীমশায়েরও মনের মতো হল না। খিঁচিয়ে উঠে তিনি বললেন, 'চড়া না রে, চড়া—গলা তো দেখি বেশ আছে তোর, চড়িয়ে দে না আরো জোরে।'

ন্যাড়া আর এক পর্দা গলা চড়াবে বলে গুন-গুন করে গলাটা শাণিয়ে নিচ্ছে, এমন সময় অধিকারীর যিনি ডান-হাত তিনি গাঁজার কল্কে থেকে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে কল্কেটা উঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'বলি, এটা না চড়ালে ওটা চড়বে কেমন করে? কদিন থেকে আমি পই-পই করে বলছি—আরে, ওসব "তির্‌তাপহরা" গান গাইতে গেলে "বোম শঙ্করী" টানের দরকার···যে গানের যে বাজনা! কিন্তু, কে কার ঝাড়ে বাঁশ কাটে···কার গইলে কেই বা ধোঁয়া দেয়!'

অধিকারী চড়ানোর ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'ঠিক বলেচে ও। কেন চড়াস না তবে, অ্যাঁ? বলি, কেন চড়াস না গাঁজা?'

'গাঁজা আমি খাই না।'

'খা-ই না, ন্যা-কা?' অধিকারী ভেংচি কেটে বলল, 'খোল ছেড়ে এসেছে কেত্তন গাইতে। সেই বেত্তান্ত! নে···চড়া!'

'এই সপ্তম কল্কে চড়ালুম, দেখি আরও ক-ছিলিম চড়াতে হয়। সুদ না নিয়ে নড়ছি না বাবা···'

সকালে মতিলালের বাড়ির সামনে বসে গাঁজাখোর লোকটা যে সুদখোর মহাজন তা শুধু তার কথাগুলো শুনেই বোঝা গিয়েছিল।

বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে লোকটাকে ন্যাড়ার প্রথম নজরে পড়ল।

‘কে আপনি ? কাকে চান ?’

রক্তবর্ণ চোখ মেলে লোকটা উত্তর দিল, ‘সে খবরে তোমার আবশ্যক ? তোমার বাপ মতিলালকে চাই। আজ তাকে ধরবই। তার জন্যে যত ছিলিমই লাগুক।’

ন্যাড়া মাথাটা নিচু করে তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতরে গেল। ভেতরের বারান্দায় মা উদ্বিগ্ন হয়ে বসে আছেন। ন্যাড়াকে দেখে আঁচল দিয়ে চোখের জল চাপতে-চাপতে বললেন, ‘দিনকে দিন এমনি করেই কি বয়ে যাবি, বাবা ? ইস্কুলে যাওয়াও তো আজকাল ছেড়ে দিয়েছিস। চিরজীবনটাই কি আমার এমনি দুঃখে-দুঃখেই কাটবে ?’

ন্যাড়া খানিকক্ষণ মাথা নিচু করে থেকে বলল, ‘ইস্কুলে অনেকদিনের মাইনে বাকি। গেলেই মাস্টারমশাই বকেন। সকলের সামনে যা নয় তাই বলে লজ্জা দেন।’

বাইরে এই সময় একটা গোলমাল শোনা গেল। ভুবনমোহিনী ব্যাকুলকণ্ঠে বলে উঠলেন, ‘ওঁর গলা বলে মনে হচ্ছে…’

কিন্তু ততক্ষণে মতিলালের গলা ডুবিয়ে মাথা তুলেছে পাওনাদারের গলা। গলা তো নয়, যেন নটের খেতে কলসী-কলসী জল ঢালছে। কথা নয়, যেন বাক্যবাণ।

‘সে কোনো কথা আমি শুনব না বাবা! আমাকে তুমি সে ধন পাওনি।’

‘বিশ্বাস করুন, আজ হাতে একটি—’

‘বিশ্বেস! তোমায় বিশ্বেস করব! সাত-সাতটে মাস কেটে গেল, আসল ছেড়ে একটি পাই পয়সাও সুদে-হাতে করলে না তুমি—মুখ নেড়ে আবার কথা বলচ কোন আক্কেলে ?’

‘আর একটা মাস অন্তত—’

‘উঁহু, একটা দিনও নয়। সুদ বলে অন্তত একটা টাকা আজ আমার চাইই চাই। হেঁটে-হেঁটে পায়ের গোড়ালি আমার কান-মুড়োয় ঠেকে যাবার দাখিল। হেঁ।’

'বিশ্বাস করুন, হাতে আজ আমার কিছুই নেই···'

'কিছু নেই তো ভিটেটা বেচতে পারো না ? খাওয়া বন্ধ করতে পারো না ? নেশা ছাড়তে পারো না ? হতচ্ছাড়া মোদো মাতাল গেঁজেল কোথাকার !'

দুম-দুম করে পা ফেলে পাওনাদার লোকটা রাগে গরগর করতে-করতে বেরিয়ে গেল।

অপমানের চূড়ান্ত হয়ে মতিলাল উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে বাড়িতে ঢুকলেন। বাড়িতে পা দিলেই পাওনাদারের তাগাদা। তাই আজকাল বাড়িতে তিনি বড় একটা থাকেন না। অথচ কোথাও গিয়ে সান্ত্বনাও মেলে না।

মতিলাল আপন মনেই বলছিলেন, 'মানুষ কি শুধু বাইরেটাই দেখবে ? অন্তরটা কি কিছু নয় ! দাশুর মা যদি আসবার সময় রাস্তার ওপর কেঁদে না পড়ত, টাকাটা তাহলে এখুনি আমি পাওনাদারের মুখের ওপর ছুঁড়ে দিতে পারতাম। কিন্তু তাহলে দাশুর মাকে আমায় বলতে হত—তোমার ছেলে ওষুধ অভাবে মরে যাক, আমার কী ! কিন্তু ও আমি পারব না। তার জন্যে যদি দেনার দায়ে ভিটেমাটি বেচতে হয় বেচবো।'

ন্যাড়ার দিকে মতিলালের চোখ পড়ল। ন্যাড়া স্কুলে যায়নি, মাইনে বাকি। মতিলালের মনে হল ন্যাড়াও যেন একজন ক্ষুদে পাওনাদার। মাথায় হঠাৎ রাগ চড়ে গেল মতিলালের।

'কে···ও, তুমি···তুমি—'

এখুনি একটা বিস্ফোরণ হবে বুঝতে পেরেই ন্যাড়া তাড়াতাড়ি সামনে থেকে সরে গেল।

'ওঃ, কোথাও কি নিষ্কৃতি নেই আমার ? ভগবান চারদিকে পেয়াদা বসিয়ে রেখেছেন। সংসারে এই ক্ষুদে পেয়াদাগুলোও যদি না থাকত—'

আড়াল থেকে কথাগুলো কানে যেতেই ন্যাড়া চমকে উঠল। তার মাথার মধ্যে কলের গানের ভাঙা রেকর্ডের মতো কেবলি বাজতে লাগল—

'ক্ষুদে পেয়াদাগুলো যদি না থাকত···ক্ষুদে পেয়াদাগুলো যদি না থাকত···'

পরদিন ন্যাড়াকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। চারদিকে খোঁজখবর করেও কোনো ফল হল না। দু-একজন তাকে স্টেশনের রাস্তায় যেতে দেখেছে বলল। সঠিক কিছু জানা না গেলেও এটুকু বোঝা গেল, ন্যাড়া নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দিয়েছে।

ভুবনমোহিনী ন্যাড়ার শোকে ভেঙে পড়লেন।

৩

রাস্তা দিয়ে চলেছে এক বিবাগী মুসাফির। কচি বয়েস। ঢল-ঢল মুখে সবে দাড়িগোঁফ উঠছে।

সামনে অন্তহীন রহস্যভরা পথ, প্রান্তর, গ্রাম, কুটির, ছায়াচ্ছন্ন গাছের সারি, দীঘি, জাঙাল।

গ্রামে-গ্রামে ছেঁকে ধরছে আবালবৃদ্ধবণিতার দল। গান শুনে আশ মিটছে না লোকের। 'আরও একটা গাও, আরও একটা গাও'—যার কাছে যা আছে উজাড় করে দিয়ে গান শুনতে চাইছে।

রাস্তার লোককে মানুষ এত ভালোবাসতেও পারে। কেউ দাদা বলে কাছে ডাকছে, কেউ বাৎসল্য জানিয়ে সন্তানস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

ঘরের টানে কিছুতেই আর বাঁধা পড়া নয়। পথের মানুষ তাই ভালোবাসার বাঁধন ছিঁড়ে আবার পথে বেরিয়ে পড়ে। নদী পেরোতে হয়। পথেঘাটে যাযাবরদের সঙ্গ। দিনগুলো নেশার মতো কাটে। রেলে টিকিট লাগে না, গলার গানই হয় পারানীর কড়ি।

পুরীর মন্দির। জগন্নাথ ধাম। অনাদিকালের দেবতাকে দেখে চোখে হঠাৎ জল এল।

'ঠাকুর, আর কেউ না জানুক তুমি তো আমার মনের কথা জানো। আমার মা-বাবা বড় দীনদুঃখী, ঠাকুর—তুমি দেখো যেন তারা কষ্ট না পায়।…'

ভাগলপুরের বাড়িতে অমরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভারি অসুখ। সারা

বাড়ি থমথম করছে। মাথার কাছে বসে ছোট ভাই অঘোরনাথ।

অমরনাথকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাতে দেখে অঘোরনাথ ঝুঁকে পড়ে জিগগেস করলেন, 'কাউকে খুঁজচ ?'

অমরনাথ ক্ষীণকণ্ঠে থেমে-থেমে বললেন, 'ভুবন এখনো এল না ? তাকে যে আমি একবার দেখে যেতে চাই।'

সঙ্গে-সঙ্গে ভুবনমোহিনীকে চলে আসার জন্যে টেলিগ্রাম আর টাকা পাঠানো হল।

ভুবনমোহিনী এলেন। অমরনাথের কাছে ন্যাড়ার পালিয়ে যাবার ব্যাপারটা চেপে রাখা গেল না। ভুবনমোহিনীর বিষাদগ্রস্ত মুখ আর ন্যাড়ার না আসা—দুটোর কোনোটাই অমরনাথের চোখ এড়ায়নি।

ভুবনমোহিনীকে ভেঙে পড়তে দেখে অমরনাথ সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'কাঁদিস্‌নে মা। জীবনে আমি কোনো অন্যায় করিনি, কারো প্রাণে ব্যথা দিইনি—যাবার আগে এই প্রার্থনাই আমি করে যাচ্ছি, তুই দেখিস্‌ মা, ন্যাড়া তোর কাছে আবার ঠিক ফিরে আসবে।'

অমরনাথের সেই অন্তিম প্রার্থনা ব্যর্থ হয়নি।

এক আকস্মিক যোগাযোগের ভেতর দিয়ে ন্যাড়া শুধু ফিরেই এল না, সব চেয়ে প্রিয় ন-দাদুর সঙ্গে তার শেষ দেখাও হল।

কলকাতার নাম-করা সলিসিটর গণেশচন্দ্র চন্দ্র ট্রেণের উঁচু ক্লাশে কলকাতায় ফিরছিলেন। ট্রেণে খুব ভিড়। আর কোথাও জায়গা না পেয়ে একটি ছেলে তাঁর কামরায় উঠে পড়ল।

ভবঘুরের উলিঝুলি পোশাক সত্ত্বেও ছেলেটির চোখেমুখে ভদ্রঘরের ছাপ। গণেশচন্দ্র কৌতূহলী হলেন।

'তোমার নাম কী, খোকা ?'

'আজ্ঞে, তাড়াতাড়িতে উঠে পড়েচি, পরের স্টেশনেই নেমে যাবো।'

'আমি তোমাকে নেমে যেতে বলছিনে। তোমার নামটা জানতে চাইছি।'

'নাম শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।'

গণেশচন্দ্র এবার ছেলেটিকে হাত ধরে পাশে বসালেন। ন্যাড়ার ভারি অস্বস্তি হচ্ছিল। কিন্তু ভদ্রলোকের সস্নেহ ব্যবহারে জোর করে উঠে যেতেও পারল না।

'অক্ষয়নাথ গাঙ্গুলী তোমার কেউ হন ?'

ছেলেটি মাথা নিচু করে চুপ করে থাকল।

গণেশচন্দ্র বুঝলেন তাঁর আন্দাজ ঠিক হয়েছে। ছেলেটির মুখের সঙ্গে তাঁর বন্ধু অক্ষয়নাথের মুখের কোথায় যেন একটা আদল আসে। অক্ষয়নাথ হলেন পরবর্তী যুগের স্বনামধন্য বিপ্লবী বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলীর পিতা। দুর্গাপিথুড়ি লেনে থাকতেন।

ছেলেটিকে চুপ করে থাকতে দেখে গণেশচন্দ্র বললেন, 'তোমার কোনো ভয় নেই। বাড়ি থেকে নিশ্চয় রাগ করে পালিয়ে বেড়াচ্ছ। চল, আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো, কেউ কিছু বলবে না। অক্ষয়নাথ তোমার কে হন যেন বললে ?'

ছেলেটি চমকে উঠে বলল, 'দাদামশায়।' বলে ফেলেই বুঝল ফাঁদে পড়ে গেছে। আর পালাবার উপায় নেই।

গণেশচন্দ্র হেসে ফেলে আদর করে ন্যাড়াকে কাছে টেনে নিলেন।

প্রথমে কলকাতা, তারপর সেখান থেকে সোজা ভাগলপুর।

ন-দাদুর তখন অন্তিম অবস্থা। শেষের কদিন ন্যাড়া সারাক্ষণ অমরনাথের শিয়রে বসে রইল।

অমরনাথের শেষ নিঃশ্বাস পড়বার সঙ্গে-সঙ্গে বাড়িটা কান্নায় ভেঙে পড়ল।

ন্যাড়া বাইরে এসে দেখে সুরেন ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। চোখের জল মুছতে-মুছতে ন্যাড়া তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল, 'কাঁদিস্‌নে সুরেনমামা, ন-দাদুর আত্মা তাহলে স্বর্গে গিয়েও তৃপ্তি পাবে না।'

৪

এন্ট্রান্সের আর মাস কয়েক বাকি। ঠিক হল ন্যাড়া পড়বে।

কিন্তু পড়ব বললেই পড়া যায় না। বেশ কিছু টাকার ধাক্কা। ইস্কুলে ভর্তি হবার খরচ তো আছেই, তাছাড়া আগের ইস্কুল থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিতে হবে। এতশত করবার পর আবার পরীক্ষার ফী জোটানোর ব্যাপার আছে।

অথচ এদিকে বড়-দাদু, মেজ-দাদু, ন-দাদু দেহ রেখেছেন। সেজো-দাদামশায় মহেন্দ্রনাথ আর ছোট-দাদু অঘোরনাথ তখন কাজ উপলক্ষে প্রায়ই বাইরে-বাইরে থাকেন। ছোট-মামা বিপ্রদাস সরকারী দপ্তরে চাকরি করেন। বিরাট সংসারের ভার একরকম তাঁরই স্কন্ধে। আর বাবার কথা না তোলাই ভালো।

ন্যাড়া মহা চিন্তায় পড়ল। মা'র ভারি ইচ্ছে ছেলে পড়াশুনা করে। কিন্তু মা'র এই সাধ কেমন করেই বা সে পূর্ণ করে? অত টাকা পাবে কোথায়?

ভুবনমোহিনীই তাকে অভয় দিলেন। বললেন, 'তুই ভাবিসনে, বাবা। তোর ছোট-মামার সঙ্গে একবার কথা বলে দেখি।'

তেজনারায়ণ জুবিলি ইস্কুলে সে সময়ে শিক্ষকতা করতেন বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। গাঙ্গুলীবাড়ির সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল। আর চারুচন্দ্র বসু ছিলেন ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। এঁদেরই দাক্ষিণ্যে ন্যাড়া শেষ পর্যন্ত ইস্কুলে ভর্তি হতে পারল।

হাতে সময় বেশি নেই। তার ওপর সমস্তই নতুন করে পড়তে হচ্ছে। কাজেই ন্যাড়াকে একটা আলাদা নিরিবিলি ঘর দেওয়া হল। বড়-দাদুর ছোট্ট পুজোর ঘর। ঘরে ছেঁড়া দড়ির খাটিয়া। খাটিয়ার নিচে স্টোভ,

কেট্‌লি, চা, জলের কুঁজো, গেলাস। ভাঙা চেয়ার আর টেবিল। প্রদীপ আর মোমবাতি। রাজেনের স্বহস্তে তৈরি বইয়ের একটি শেল্‌ফ্‌।

রাত্রে বিপ্রদাসকে খেতে দিয়ে সামনে বসে ভুবনমোহিনী বললেন, 'খোকা বলছিল কী নাকি ফী-র অনেক টাকা লাগবে? অথচ তোর তো এখন···'

'সে তুমি ভেবো না, যাহোক করে হয়ে যাবে। টাকার জন্যে গুলজারীলালকে বলে রেখেছি। মাসে-মাসে শোধ করব। কিছু সুদ লাগবে এই যা। কত ফী দিতে হবে সেটা তুমি শুধু একবার খোকার কাছ থেকে জেনে নিও।'

'খোকাকে ডাকব?'

'না, না। ও এখন পড়ছে পড়ুক। কাল সকালবেলায় জেনে নিলেই হবে।'

পরীক্ষার পর হাতে অফুরন্ত সময়।

গাঙ্গুলীবাড়িতে কুসুমকামিনী দেবীর ঘরে রাত্রে বসে সাহিত্যের বৈঠক। অনেকদিন পর ন্যাড়া আবার এখন নিয়মিত শ্রোতা।

উপেনের দাদা লালমোহনের হাতে বই। শ্রোতার দল তাঁকে ঘিরে বসেছে। ন্যাড়া জিগগেস করে, 'বোম-মামা, কী বই ওটা?'

লালমোহন বইয়ের মলাটটা খুলে ধরেন ন্যাড়া যাতে দেখতে পায়। মলাটের ওপর লেখা : প্রকৃতির প্রতিশোধ···শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তারপর লালমোহন পড়তে থাকেন :

> 'হে বিশ্ব, হে মহাতরী চলেছ কোথায়,
> আমারে তুলিয়া লও তোমার আশ্রয়ে—
> একা আমি সাঁতারিয়া পারিব না যেতে।

কোটি কোটি যাত্রী ওই যেতেছে চলিয়া,
আমিও চলিতে চাই উহাদেরি সাথে।...'

সুরেলা আবহাওয়ায় ঘরটা থমথম করছে। ন্যাড়া সকলের অগোচরে বাইরে এসে দাঁড়াল। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় তার চোখের কোণে জল চিকচিক করছে। পৃথিবীটা বদলে যাচ্ছে। বুকের ভেতর থেকে কথার স্রোত যেন বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তারাভরা আকাশটা যেন একটা প্রকাণ্ড নীল পুঁথির মতো দেখাচ্ছে।

ন্যাড়া আর রাজু অনেকদিন পর আবার একসঙ্গে জুটেছে।

সন্ধ্যে হয়-হয়, ন্যাড়া আর রাজুকে হনহন করে এসে রাস্তার এক জায়গায় থেমে পড়তে দেখা গেল। তাদের নজর পড়েছিল রাস্তার দুপাশে দুটো সমান্তরাল গাছে। তারপর দুজনে একটা শক্ত কাছি দুই গাছে বেঁধে ফেলল।

গাছের সঙ্গে কাছিটা বাঁধতে-বাঁধতে ন্যাড়া বলল, 'আজ দেখে নেওয়া যাবে সাহেব কত বীরপুরুষ!'

রাজু বলল, 'যে হাতটা দিয়ে মাস্টারমশায়ের গায়ে চাবুক মেরেছে, সেই হাতটাই ওর নুলো করে দেবো। দড়িটা খুব শক্ত করে বাঁধিস।'

ন্যাড়া জবাব দিল, 'শক্ত করেই বেঁধেছি, রাজুদা।'

অন্ধকার ঘনিয়ে এল। খানিক পরে দূরে টমটমের টক-টক আওয়াজ শোনা গেল। রাজু আর ন্যাড়া দুজনে রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে পড়ল। আওয়াজটা ক্রমেই কাছে আসছে। ক্রমেই কাছে। সেই আওয়াজের সঙ্গে যেন নতুন করে ভেসে আসছে সেই নিরীহ মাস্টারমশায়ের আর্তনাদ—আগের দিন সন্ধ্যায় মাতাল সাহেবের গাড়ির সামনে পড়াই যাঁর ছিল একমাত্র অপরাধ।

ঘোড়ার পা দড়িতে মোক্ষমভাবে আটকাতেই ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়িটা থেমে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে রাজু বিদ্যুৎগতিতে সাহেবের হাতের চাবুক কেড়ে নিল। তারপর সেই চাবুক সপাং-সপাং করে পড়তে লাগল সাহেবের পিঠে।

তার পরের দৃশ্যটা যেমন করুণ তেমনি মজার। গাড়ি থেকে নেমে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে নাক-কান মলে সাহেবকে শেষ পর্যন্ত প্রাণের দায়ে ক্ষমা চাইতে হল। ন্যাড়া কিম্বা রাজুর কাছে ক্ষমা চাওয়া নয়, ক্ষমা চাইতে হল সমস্ত ভারতবাসীর কাছে। তাও তার নিজস্ব ইংরেজিতে নয়, ন্যাড়ার নেটিভ ইংরেজিতে। সাহেবকে শপথ করতে হল, কোনো নিরীহ ভারতবাসীর গায়ে আর কখনো সে হাত তুলবে না।

তারপর সাহেবকে গাড়িতে উঠিয়ে কাছিটা কেটে দেওয়া হল। গাড়িটা ছুটে বেরিয়ে গেলেও দেখা গেল সাহেব তখনো লজ্জায় মাথা নিচু করে আছে।

খবরটা সেই রাত্তিরেই মাস্টারমশাইকে দেবার জন্যে ন্যাড়া আর রাজু তক্ষুনি রওনা হল।

মাস্টারমশাই বিছানায় শুয়েছিলেন। সারা শরীরে ব্যথা। ন্যাড়া আর রাজুকে তিনি কাছে ডাকলেন।

আগাগোড়া ঘটনাটা ন্যাড়াই বলে গেল। আস্তে-আস্তে মাস্টার-মশাইয়ের মুখে আনন্দের আভা ফুটে উঠতে লাগল। ন্যাড়ার কথা শেষ হতেই তিনি উঠে বসে দুজনকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর দুহাত তুলে দুজনকে আশীর্বাদ জানালেন: 'বেঁচে থাকো বাবা, দেশ আর দশের মুখ তোমরা উজ্জ্বল করো।'

তারপর অন্দরমহলের দিকে গলা তুলে ডাকলেন, 'ওগো শুনে যাও, কারা এসেছে দেখ। আমার সমস্ত ব্যথা ভালো হয়ে গেছে। একবার দেখে যাও।'

একদিন হাতে একটা কাগজ নিয়ে ছুটতে-ছুটতে বাড়িতে এলেন বিপ্রদাস।

'ও মেজদি, মেজদি—মিষ্টিমুখ করাও। ন্যাড়া পাশ করেছে।'

সবে ফল বেরিয়েছে এণ্ট্রান্সের। বিপ্রদাস দেখালেন ছাপার অক্ষরে নাম লেখা : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—দ্বিতীয় বিভাগ।

ইস্কুল ছেড়ে ন্যাড়া ভর্তি হল টি. এন. জুবিলি কলেজে—এফ-এ ক্লাসে।

ভুবনমোহিনীর চোখ দিয়ে আনন্দের অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

৫

রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে আদমপুর ক্লাব। রাজা শিবচন্দ্রের একমাত্র সন্তান কুমার সতীশচন্দ্রই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা।

বিলেত যাওয়ার অপরাধে শিবচন্দ্র সমাজে একঘরে হয়েছিলেন। কিন্তু উদার অমায়িক ব্যবহারে স্থানীয় তরুণদের মন তিনি এমনভাবে জয় করেছিলেন যে, তারা সমাজের শাসনবারণ অগ্রাহ্য করে দলে-দলে আদমপুর ক্লাবে এসে ভিড় করল।

শিবচন্দ্রের বাড়িতেই ক্লাবঘর। সমস্ত ঘর জুড়ে আধুনিক রুচির পরিচয়। মেঝের ওপর কার্পেট, তার ওপর ধবধবে ফরাস পাতা। নক্সা-কাটা ফুলদানিতে দেশী-বিদেশী ফুলের বাহার। দেয়ালে সুন্দর-সুন্দর ছবি টাঙানো। একপাশে খেলাধুলোর সরঞ্জাম—ক্রিকেটের ব্যাট, উইকেট। ঘরের এককোণে প্রকাণ্ড বিলিয়ার্ডের টেবিল। ইতস্তত ছড়ানো শিকারের বিবিধ স্মৃতিচিহ্ন।

খেলাধুলো ছাড়াও ক্লাবের একটা বড় আকর্ষণ হল নাটক। মাঝে-মাঝে সাহিত্যেরও বৈঠক হয়।

কুমার সতীশচন্দ্র ন্যাড়ার বন্ধু। আদমপুর ক্লাব নিয়ে ন্যাড়াও মত্ত। তার বেশির ভাগ সময় কাটে রাজা শিবচন্দ্রের বাড়িতে।

ক্লাব থেকে ফেরার পথে একদিন দর্পনারায়ণের সঙ্গে দেখা। ন্যাড়া কাপড়ের খুঁট দিয়ে তখন মুখ আর হাতের ঘাম মুচ্ছিল।

আধ-বুড়ো বেঁটে খাটো চেহারা দর্পনারায়ণের। ঝাঁটার কাঠির মতো খোঁচা-খোঁচা গোঁফদাড়ি। পরণে আধ-ইঞ্চি লাল-পাড় খেঁটে ধুতি। মাথায় লম্বা টিকি। পৈতে-বার-করা খালি গা। পায়ে তালি-মারা চটি। ছোকরার দল তার নাম দিয়েছে 'দগ্ধ নাড়াবন'।

শিবচন্দ্রের বাড়ির দিক থেকে ন্যাড়াকে আসতে দেখে দর্পনারায়ণ যেন দপ করে জ্বলে উঠলেন। নাঃ, ঐ ম্লেচ্ছটাকে নিয়ে আর পারা গেল না—বিলেত গিয়ে নিজের জাত তো খুইয়েছেই, এখন বুড়োবয়েসে এই হাড়হাবাতে ছোঁড়াগুলোর মাথা খাচ্ছে।

দর্পনারায়ণ হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, 'বলি, ঐ ম্লেচ্ছটার বাড়ি থেকে কিসের ঠ্যাং ভক্ষণ করে আসা হল?'

ন্যাড়া বুঝল মুখ মোছা দেখেই দর্পনারায়ণ সন্দেহ করেছেন। দর্পনারায়ণকে চটাবার জন্যেই ন্যাড়া এবার এমন একটা ভঙ্গিতে মুখ মুছে 'কই, না তো' বলল যাতে দর্পনারায়ণের সন্দেহটা আরও পাকা হয়।

কিন্তু ঘোষপাড়ার নিমাই হঠাৎ ছুটতে-ছুটতে এসে দর্পনারায়ণের পায়ে আছড়ে পড়ায় ঘটনাটা অন্যদিকে মোড় নিল।

নিমাই কাঁদতে-কাঁদতে বলছিল, 'ভট্চাযিমশাই, আপনার পায়ে পড়ি। দয়া করে বিধেনটা দিয়ে দ্যান আমারে। পিতৃদায়—এই বেলা পর্যন্ত ঘরে রয়েচে, কেউ মড়া নিয়ে যেতে সাহস কচ্চে না গো…'

দর্পনারায়ণ ফ্যাসফেঁসে গলায় অট্ট হেসে বললেন, 'নিয়ে যেতে সাহস কচ্চে না! হেঁ—এবার যে বড় নাকে কাঁদুনি। যা না, আমি কী করব তার?'

ন্যাড়া অবাক হয়ে জিগগেস করল, 'ব্যাপার কী, নিমাই?'

চোখ মুছে দাঁড়িয়ে উঠে নিমাই বলল, 'বাবাঠাকুরের ঘরে দুধের যোগান দেতম, বাবু। এট্টা টাকা বাকি পড়েছিল বহুৎদিন থেকে। দোষের মধ্যে টাকাটা একদিন পাঁচজনের সাক্ষেতে চেইছি। তাতেই বাবাঠাকুরের চক্ষু নালবন্নো হল, সমাজে মোদের ধোপানাপিত বন্ধ করে দেলে।'

দর্পনারায়ণ ফোঁস করে উঠলেন, 'দেবে না? পাজী নচ্ছার হারাম-জাদা! তোর ঐ সামান্য একটা টাকার জন্যে আমি ঘরের চাল কেটে

নিয়ে পালিয়ে যেতাম, না ? যত্তো সব ছোটলোকের মরণ ! যা না—যা এখন তোর পাঁচ বাপের কাছে, তারা এসে বিহিত করুক ।'

ন্যাড়ার মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। এত নিচু মন নিয়ে জাতের বড়াই !

দর্পনারায়ণের দিকে একবার তাকিয়ে অগ্নিবর্ষণ করে ন্যাড়া নিমাইকে ডাকল, 'চলো নিমাই, আমি মড়া নিয়ে যাবো ।'

দর্পনারায়ণ চমকে উঠলেন। বামুনের ছেলে হয়ে বলে কী ! ভয় দেখিয়ে বললেন, 'জানো তুমি কার মড়া ?'

ন্যাড়া এবার অপমান করার জন্যেই জবাব দিল, 'নিশ্চয় আপনার নয় ।'

দর্পনারায়ণ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কী, এত বড় আস্পর্ধা—'

বাকি কথাগুলো শোনার জন্যে ন্যাড়া আর দাঁড়াল না।

তৃতীয় অধ্যায়

১

১৯০৩ খৃষ্টাব্দ।

বঙ্গোপসাগরের বুকে দুলতে-দুলতে চলেছে জাহাজ। যতদূর দেখা যায়, শুধু বড়-বড় ঢেউ; সামনে দূর দিগন্ত থেকে উঠে কাছে এসে-এসে তারপর পেছনে দূর দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। তটরেখার শেষ-চিহ্নটিও এখন লুপ্ত। দেবানন্দপুরের পায়ে-চলা-রাস্তা, ভাগলপুরের শানবাঁধানো ঘাট, মজঃফরপুরের রোদে-পোড়া মাটি—এখন সমস্তই এক নীল যবনিকার অন্তরালে।

পিছিয়ে যাওয়া ঢেউগুলোর দিকে তাকিয়ে কত কথা মনে আসছে। ইস্কুল ছেড়ে কলেজ। তারপর জীবনের বিচিত্র গতিপথে আনন্দবিষাদে ভরা আটটি বছর।

ডেকের ওপর রোদ্দুরের মিষ্টি আমেজে স্মৃতির রোমন্থন চলেছে। পাতলা-পাতলা চুল হাওয়ায় উড়ছে। পুড়ে-পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে হাতের জ্বলন্ত সিগারেট।

আট বছর আগেকার সেই জগদ্ধাত্রী পুজোর দিনটার কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে। গাঙ্গুলীবাড়িতে ভোজের পাতা পড়েছে। পরিবেশনকারীর দলে ন্যাড়াকে দেখে দর্পনারায়ণের দল রাগ করে উঠে চলে গেলেন। ন্যাড়া সমাজে পতিত, সুতরাং তার ছোঁয়া তাঁরা খাবেন না।

সেদিন রাত্রে অসুস্থ শরীরে মা খুব কেঁদেছিলেন। বলেছিলেন, 'দেবতা-সমাজ-ব্রাহ্মণ-ধর্ম—তুই কি কিছুই মানবিনে? এ তুই কী করলি বাবা? শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালোবাসার পরীক্ষা কি এমনি করে দিতে হয়?'

তারপর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বলেছিলেন, 'আমি মারা গেলে কী যে হবে তোর, কে তোকে দেখবে, বুঝে-সমঝে সামলে নিয়ে চলবে! ও মা, তুই কাঁদছিস্? পাগল ছেলে আমার, মা কি কারো চিরকাল বাঁচে?'

চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'একটা কথা আমার সব সময় মনে রাখিস—জীবনে যখন যে অবস্থাই আসুক না কেন, কখনো যেন কাউকে দুঃখ দিসনে। সবাইকে ভালোবেসে চলিস। চোখের দেখার চেয়ে বড় হল অন্তর দিয়ে অন্তরটা দেখা। আর এটাই বোধহয় সংসারে সবচেয়ে কঠিন কাজ।'

তার কদিন পরেই মা মারা গেলেন। আশ্চর্য, এই আট বছর পরেও মা'র মুখ মনে করলেই চোখের কোণে আপনি জল এসে যায়।

মামার বাড়ির পাট চুকিয়ে তারপর খঞ্জরপুরের বাসাবাড়িতে উঠে যাওয়া।

লেখাপড়া চুলোয় গেল। আদমপুর ক্লাব জমজমাট। গান-বাজনা থিয়েটারের নেশা তখন রীতিমতো পেয়ে বসেছে।

আর ঠিক সেই সময় রাজুদার উধাও হয়ে যাওয়া।

উকিল চন্দ্রশেখর সরকারমশায়ের বাড়িতে 'বিল্বমঙ্গল' অভিনয় হচ্ছিল। 'চিন্তামণি' আর 'পাগলিনী'র ভূমিকায় শরৎ আর রাজেন্দ্র। মুহুর্মুহু করতালির মধ্যে অভিনয় শেষ হল। গ্রীনরুমের সামনে ভিড়। অভিনেতা দুজনকে দর্শকরা অভিনন্দন জানাতে চায়।

কিন্তু রাজুদাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। সে রাত্রে নয়, পরের দিন নয়—মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে যাবার পরেও নয়।

সমস্ত এলোমেলো হয়ে গেল। সারাদিন অস্থির হৃদয়ে শুধু পথে-

পথে ঘোরা। ঘরে শান্তি নেই, বাইরের প্রতিটি ধূলিকণায় রাজুদার স্মৃতি।

মা মারা যাবার পর থেকে বাবাও কেমন যেন হয়ে গেছেন। অভাবের জ্বালায় মাথার ঠিক নেই। দেনার দায়ে দেবানন্দপুরের বসতবাড়িটা বিক্রি হয়ে গেছে। কোনোদিক দিয়েই কিছুতে চালানো যাচ্ছে না। গোটা সংসার একা মাথায় নিয়ে বাবা পড়েছেন অকূল পাথারে।

ছেলেটাও যদি মানুষ হত! তা নয়, দিনরাত 'রাজুদা' আর 'রাজুদা'!

কিন্তু তখন রাজুদাকে ভোলবার জন্যেই চলেছে তপস্যা। পুঁটুদের বাড়িতে সারাদিন বসে-বসে বই পড়া। বাকি সময়টা নিজেরা গল্প-কবিতা লিখে আসর জমিয়ে পড়া। পুঁটুর বোন বালবিধবা বুড়িও ছিল এই আসরের একজন নিয়মিত লেখিকা।

একদিন বাবার সঙ্গে বাড়িতে হঠাৎ সামনাসামনি দেখা। বাবা যেন আগে থেকেই জিভ শাণিয়ে রেখেছিলেন। কোনোরকম ভূমিকা না করেই বললেন, 'ঐ রাজুই তোমার মাথা খেয়েছে। এখনো বলছি, ভবিষ্যতের কথা একটু ভাবো। শুধু গানবাজনা আর লেখালিখি করে পেট ভরবে না। আমি আর পারছি না চালাতে।'

তারপর একটু থেমে বললেন, 'এসব কথা আমি তোমাকে বলতাম. না। কিন্তু তুমি এখন বড় হয়েছ। তুমি ছাড়া কেই বা আমার দুঃখ বুঝবে। শেষ সম্বল এখন একটা দামী পাথর—আজ সেটাও বিক্রি করে না এলে উনুনে হাঁড়ি চড়বে না। চাবিটা দিচ্ছি, তুমি সিন্দুকটা খুলে পাথরটা নিয়ে এসো।'

বাবা অবাক হয়ে তাকালেন। 'কী. চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে! যাও না, সিন্দুকটা খুলে নিজের চোখেই দেখে এসো। পাথরটা ছাড়া আর কিচ্ছু নেই।'

ছেলে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বাবার চোখে অশুভ সন্দেহ—'ও কি, কাঁদছিস্ কেন ? কী হয়েছে বল্। তুই কি তবে আমার শেষ সম্বলেও হাত দিয়েছিস্ ?'

তারপর একটা চিৎকার : 'বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা আমার সামনে থেকে। তোর মুখ আর আমি দেখতে চাই না।'

এক বন্ধুকে বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্যেই কদিন আগে রাত্রে সিন্ধুক থেকে চুরি করে পাথরটা বাঁধা দিতে হয়েছিল। ভরসা ছিল কিছুদিনের মধ্যেই পাথরটা ছাড়িয়ে আনা যাবে।

সব হিসেব গোলমাল হয়ে গেল। সেদিন সেই মুহূর্তে সংসারের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়বার সময় কে ভেবেছিল জীবনে আর কোনোদিনই বাবার সঙ্গে দেখা হবে না ?······

শেষ হয়ে আসা সিগারেটটা থেকে আরও একটা সিগারেটের মুখাগ্নি হল। জাহাজটা দুলছে। সিগারেটটা ধরিয়ে নিতেও তাই সময় লাগল।

জলের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ভেসে এল আবার পুরনো স্মৃতির চলমান চিত্র।

পরনে গেরুয়া। হাতে দণ্ড। মাথা আর মুখ জুড়ে সন্ন্যাসীর চুলদাড়ি। কাঁধে সংক্ষিপ্ত ঝোলা।

গ্রাম থেকে গ্রামে, তীর্থ থেকে তীর্থান্তরে ঘুরে-ঘুরে বেড়ানো। বিভিন্ন মার্গের সন্ন্যাসাশ্রমে দিনের পর দিন রাতের পর রাত কেটে যায়। কতরকমের তান্ত্রিক যোগী। সামনে সমানে জ্বলছে ধুনী, পঞ্চমুখী গাঁজার কল্কেয় সর্বনেশে টান।

তারপর মজঃফরপুরের ধর্মশালা থেকে ঘটনাচক্রে শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। শিখরনাথের স্ত্রী বিখ্যাত লেখিকা অনুরূপা দেবী।

শিখরনাথ গানের ভক্ত। তাঁর আতিথ্যে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ খুলে নতুন করে শিল্পীর আত্মপ্রকাশ হল।

রাজা মহাদেব সাহুর সঙ্গে পরিচয় শিখরনাথেরই বাড়িতে।

রাজা সাহেবের গান-বাজনা-শিকারের শখ। খুব রসিক মানুষ।

বাড়িতে তাঁর বিরাট সুসজ্জিত জলসাঘর। চারিদিকে প্রাচুর্যের ছড়াছড়ি।

সেখানে উন্মুক্ত হল জীবনের এক নতুন দৃশ্যপট।

জাহাজটা দুলছে। দূরের ঢেউগুলো আস্তে-আস্তে এক নটীর ঘাঘরায় মিলিয়ে গেল।...

জলসাঘরে নাচছে লক্ষ্ণৌর সেই বিখ্যাত বাঈজী, রাজাসাহেবের সঙ্গে শিকারে গিয়ে যার সঙ্গে কয়েক মুহূর্তের আলাপ।

বনের মধ্যে পা টিপে-টিপে এসে উদ্যত বন্দুকের নল হাত দিয়ে সরিয়ে লক্ষ্যচ্যুত করে মেয়েটি খিল-খিল করে হেসে বলেছিল, 'জ্যরা নিশানা সামালকে—।'

তারপর চোখে চোখ রেখে জিগগেস করেছিল, 'আপ কৌন হ্যায়, জনাব ?'

রাজাসাহেব এসে পরস্পরকে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। ছোট্ট সংক্ষিপ্ত আলাপ। শিকার আর সেদিন জমল না।

বাঈজীর পশ্চিমা বেশবাস, চোস্ত উর্দু বুলি—অথচ বাঙালী মেয়ের মতো কমনীয় মুখ। হাঁটার মধ্যে খুব একটা চেনা-চেনা ভাব। অনেকদিন আগে কোথায় যেন দেখা।

তারপর শহরে ফিরে জলসাঘরে তাকে দেখা গেল নাচতে। ঘর ছেড়ে মন বারবার উধাও হয়ে যাচ্ছিল। যেন খোলা আকাশের নিচে, প্রকৃতির গায়ে কোথাও গা মিশিয়ে আছে এ মুখের আদল। কিন্তু কোথায়, কিছুতেই ঠাহর হচ্ছে না।

বাঈজীর মধুক্ষরা কণ্ঠে ঘর জুড়ে সুরের মদিরতা। গভীর কালো ভ্রূভঙ্গে পাতলা টুকটুকে ঠোঁটে কখনো উচ্ছল আনন্দ, কখনো বেদনার বিধুরতা। আঙুলের বিচিত্র মুদ্রায়, ছন্দিত পায়ে-পায়ে জেগে-জেগে

উঠছে দূরাগত স্মৃতি, জীবনের স্বপ্ন। নাচের তালে-তালে ঢেউ খেলছে ঘাঘরায়, লুটিয়ে-লুটিয়ে পড়ছে বুকের শিথিল ওড়না।

ঠিক সেই সময় এক চাপরাশি হাতে ক'রে আনল এক মর্মান্তিক তার।

বাবা মারা গেছেন! ঝাড়লণ্ঠনগুলো যেন এক ফুৎকারে নিভে গেল, স্তব্ধ হয়ে গেল সঙ্গীতের মীড়মূর্ছনা।...

সাইকেল ছুটছে স্টেশনের দিকে। ট্রেণের এখনো কিছুটা দেরি। কিন্তু যাবার জন্যে মন ছটফট করছে।

'বাবুজী...বাবুজী...বাবুজী'...

নারীকণ্ঠের ডাক শুনে সাইকেল থেমে গেল।

'জারাসে ঠাহর যাইয়ে, বাবুজী। ঘর পর এক দফে আইয়ে।' বাঈজী। গৃহস্থ বধূর মতো নিরাভরণ তার সাজ।

'কে? ও, তুমি! কিন্তু আমার যে সময় নেই।'

'আমি জানি। আর সেইজন্যেই ডাকলাম।'

'তুমি বাঙালী? আমাকে চেনো?' বিস্ময়ে বাক্‌রোধ হল।

বাঈজীর চোখ মাটির দিকে নামানো। খানিকক্ষণের স্তব্ধতা।

'আমিও চিনতে পারছি। কিন্তু আজ এ অবস্থায় তোমাকে চিনতে না পারলেই ভালো ছিল।'

'কেন? নিচে নেমেছি বলে?'

'না। আমি সংসারের সমস্ত বন্ধন কাটাতে চাই।'

'তুমি নিষ্ঠুর। তুমি আছো জেনেই এ শহরে আমি ছুটে এসেছিলাম। সারাটা জীবন ধরে তোমাকে আমি খুঁজেছি।'

বাঈজীর দুচোখে জল।

'আমাকে আর নতুন করে মায়ায় জড়িও না। যেতে দাও।'

'আমি কি অনন্তকাল ধরে শুধু অপেক্ষাই করব?—'

ছুটন্ত সাইকেলের ধুলোয় পথ সে প্রশ্নটাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল।

২

জাহাজ এসে ভিড়ল রেঙ্গুনের জেটিতে।

দূর থেকে শহরটা দেখাচ্ছিল পটে-আঁকা অপরূপ ছবির মতো।

বন্দরে অপরিচিত ভাষার কলরব।...

মেসোমশাইয়ের বাড়ি খুঁজে বার করতে খুব বেশি বেগ পেতে হল না। মেসোমশাই অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় রেঙ্গুনের বেশ পসার প্রতিপত্তিশালী উকিল। শরৎ ভাগলপুরে এফ-এ না পড়ে রেঙ্গুনে এসে বর্মী ভাষা শিখে যদি ওকালতি করে, তাহলে ওকে আর ভবিষ্যতের জন্যে ভাবতে হবে না—মতিলাল বেঁচে থাকতে একথা তিনি অনেকবার লিখে জানিয়েছিলেন। কোনো ফল হয়নি।

শেষ পর্যন্ত নিজে থেকে শরৎ রেঙ্গুনে চলে আসায় মেসোমশাই খুব খুশিই হয়েছিলেন। মাসীমা কান্নাকাটি করলেন—শরৎকে দেখে অনেকের অনেক স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছিল।

কে কেমন আছে তার ফিরিস্তি দিতে হল।

বড়দি অনিলার অনেকদিন আগেই বিয়ে হয়ে গেছে। সামতাবেড়ের বনেদী মুখুয্যে পরিবারে। ভাই-বোনরা আর সবাই ছোট।

পরের বাড়িতে মানুষ হচ্ছে মা-মরা ছোট বোন মুনিয়া। মেজ ভাই প্রভাস ভাগলপুরে স্টেশনমাস্টারের কাজ শিখছে। ছোট প্রকাশ আছে জলপাইগুড়িতে। এই ছত্রভঙ্গ সংসারটার সমস্ত দায়িত্বই এখন শরৎচন্দ্রের কাঁধে।

বর্মায় এসে প্রথমেই যাঁর সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গতা হল, তাঁর নাম

গিরীন্দ্রনাথ সরকার। গিরীনবাবু ভূপর্যটক ও সরকারী কন্ট্রাক্টর। সরকারী ওপর মহল থেকে শুরু করে নানারকম বেসরকারী সামাজিক প্রতিষ্ঠান—তাঁর নামডাক ও গতিবিধি ছিল সর্বত্র।

ঘুরে-ঘুরে রেঙুন দেখার ব্যাপারে গিরীনবাবু হলেন শরৎচন্দ্রের সঙ্গী। শরৎচন্দ্রের গানের গলা এবং আত্মভোলা স্বভাব তাঁকে এত মুগ্ধ করেছিল যে, শরৎচন্দ্রকে তিনি 'দাদা' বলে ডাকতেন।

গিরীনবাবু সঙ্গে থাকলে শরৎচন্দ্রেরও ভারি সুবিধে। বর্মী ভাষা যতদিন না আয়ত্ত হচ্ছে, গিরীনবাবুকেই দোভাষীর কাজে লাগানো যায়।

বিচিত্র এদেশের পথঘাট। বিচিত্র মানুষ। আকাশে মাথা-উঁচু-করা প্যাগোডার সারি।

শরৎচন্দ্রের চোখে বিস্ময়। হোক না অচেনা, তবু এই জনসমুদ্রের গভীরে ডুব না দিয়ে তাঁর শান্তি নেই। মানুষ চিরদিনই তাঁকে টানে—স্বদেশেরই হোক আর বিদেশেরই হোক।

চলতে-চলতে শরৎচন্দ্র হঠাৎ গিরীনবাবুকে ঠেলেন—'কী ব্যাপার ওখানে, গিরীন?' শরৎচন্দ্রের অঙ্গুলি-নির্দেশ অনুসরণ করে গিরীনবাবু দেখলেন একদল পুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে একদল বর্মী মেয়ে কলকল করে সমানে কি সব বলে চলেছে।

গিরীনবাবু হেসে বললেন, 'ও কিছু নয়। মেয়েগুলো ওদের কাছে মাছ কিনতে চাইছে।'

'কিন্তু ওদের হাতে তো ছিপ। দেখে তো জেলে বলে মনে হচ্ছে না?'

উত্তরে গিরীনবাবু যা বললেন তাতে জানা গেল, এদেশে মরা মাছের খুব কদর। লোকে দেখলেই কিনতে চায়। কেননা জ্যান্ত মাছ মেরে খাওয়াটা এদের কাছে অধর্ম। এরা জ্যান্ত মাছ কিনে পুকুরে ছেড়ে দেয়, শিকারীদের কাছ থেকে জ্যান্ত পাখি কিনে আকাশে উড়িয়ে দেয়।

শুনে শরৎচন্দ্র বললেন, 'তাহলে তো দেখছি একদিন গুচ্ছের মাছ মেরে ওদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হবে!'

'উঁহু, ওরা অমনি নেবার পাত্র নয়। যা নেবার পয়সা দিয়ে নেবে। যদি বোঝে, মতলব খারাপ—সঙ্গে-সঙ্গে ফনানে-ছা!'

'ফনানে-ছা আবার কী?'

'জুতোপেটা।'

শুনে শরৎচন্দ্র খুব একচোট হাসলেন।

এদেশে মেয়েরাই বলতে গেলে সব। পনেরো আনা মেয়েই লেখা-পড়া জানে। বাজার-হাট, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্ম-কর্ম—সবই মেয়েদের হাতে। তারা রাস্তাঘাটে খোঁপায় ফুল গুঁজে মাথা উঁচু করে বেড়ায়। কোনো পুরুষ এতটুকু অসম্মান করেছে কি পায়ের জুতো খুলে পেটায়।

কথা বলতে-বলতে কখন যে শহর ছাড়িয়ে দুজনে মেঠো রাস্তায় এসে পড়েছেন খেয়াল নেই।

হঠাৎ একটা সোরগোল শোনা গেল: 'সাপ···সাপ—'

সামনে দিয়ে এক বীরপুঙ্গব হাতে বন্দুক নিয়ে ছুটতে-ছুটতে আসছিলেন। 'পালান, মশাই—মস্ত বড় সাপ,' বলতে-বলতে তিনি ঊর্ধ্বশ্বাসে পালালেন।

গিরীনবাবুরও ছুটে পালাতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু শরৎচন্দ্র বাদ সাধলেন। 'দাঁড়াও না, গিরীন; একবার দেখেই যাই।'

গিরীনবাবু বিরসমুখে বললেন, 'দেখবার আগেই যে আমার কালঘাম ছুটছে, শরৎদা।'

এমন সময় হাতে একখানা লম্বা দা নিয়ে ছুটে এল এঁকজন বর্মী ছোকরা। জিগগেস করল, 'কী হয়েছে, বাবুজি?'

'সাপ।'

'কোনখানে?'

‘ঐদিকে।’

‘ধরে আনি তো কী দেবেন, বাবুজি ?’

‘পারো তুমি সাপ ধরতে ? ধরতে পারলে বখশিস্ দেবো।’

শরৎচন্দ্রই কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন। দা হাতে নিয়ে ছেলেটাকে এগিয়ে যেতে দেখে বললেন, ‘আচ্ছা, ডাকাবুকো তো !’

গিরীনবাবু জবাব দিলেন, ‘দা হাতে থাকলে ওরা যমকেও ডরায় না।’

ছেলেটা সত্যিই সাপ ধরে নিয়ে এসে হাজির। প্রকাণ্ড গোখরো সাপ তার হাতটাকে পেঁচিয়ে ফেলেছে। শক্ত মুঠোর মধ্যে সাপের শুধু মুখটা সে ধরে রেখেছে।

গিরীনবাবুকে ভয় পেতে দেখে ছেলেটা তাঁকে অভয় দিয়ে তার বাঁহাতের কব্জিটা দেখিয়ে বলল, এই দেখুন, সেলাই করা—এর মধ্যে গাছের শেকড় আছে।’

গিরীনবাবু তাড়াতাড়ি দুটো টাকা বার করে দিলেন। ছেলেটা খুশি হয়ে সেলাম করে গ্রামের রাস্তা ধরে চলে গেল।

শরৎচন্দ্র খুশি হয়ে বললেন, ‘অনেকদিন পর সাপটাকে দেখে জীবনের পুরনো একটা স্বাদ যেন ফিরে পাওয়া গেল।’

৩

সংসারে কিছু লোক থাকে, যাদের এমনই কপাল যে কিছুতেই কোথাও থিতিয়ে বসতে পারে না। ইচ্ছে থাকলেও নয়। পথ যেন তাদের সারা জীবন নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

শরৎচন্দ্রেরও হল তাই। আইন পড়ে যেখানে তাঁর পশারওলা উকিল হবার কথা, সেখানে প্রথম ধাপ থেকেই তাঁকে হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হল। বর্মী ভাষায় তিনি পাশ করতে পারলেন না। কাজেই উকিল হবার আশা ছাড়তে হল।

আর ঠিক এই সময় মেসোমশাই হঠাৎ এক কঠিন রোগে মরণাপন্ন হলেন। মেসোমশাই শেষ পর্যন্ত সেরে উঠলেন বটে, কিন্তু ততদিনে শরৎচন্দ্রেরও সংসারের বদ্ধ জীবনে অরুচি ধরেছে।

তারপর বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশে উত্তর বর্মার জটিল অলিগলিতে ঘুরে বেড়ানো। চোর-জোচ্চোর, মগ, ডাকাত, আবগারী চোরা চালানদার, খুনে, বোম্বেটে—হাজার রকম মানুষের ভিড় সেখানে। অন্ধকার গলির বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

তারপর ঘুরতে-ঘুরতে পেগু শহর। রুজি-রোজগারের একটা কাজও জুটে গেল। যেখানে আস্তানা মিলল, তার আশেপাশে দিন-আনা দিন-খাওয়া সাধারণ মানুষ। শরৎচন্দ্র অল্পদিনেই হয়ে উঠলেন তাদের 'দাদাঠাকুর'। লোকজনের নিরন্তর আনাগোনায় তাঁর আর ফুরসত বলে কিছু রইল না। আপদে-বিপদে দাদাঠাকুরের কাছেই তারা ছুটে আসে।

একবার একজন এসে ধরল, 'দাদাঠাকুর, এই ছেলেটার একটা হিল্লে করে দিতে হয়। চক্কোত্তি বামুনের ছেলে। বড্ড দুঃস্থ, লেখাপড়া জানে সামান্য। চাটগাঁয়ে বাড়ি। কোথাও একটা কাজ জুটিয়ে না দিলে বেচারা না খেয়ে মরবে।'

শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী-সন্তানের দিকে তাকালেন। বললেন, 'তা যখন বলছ, চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

শেষ পর্যন্ত চেষ্টাচরিত্র করে একটা কাঠের গোলায় শরৎচন্দ্র বলে কয়ে তাকে কাজে লাগিয়ে দিলেন।

তারপর ছেলেটির সঙ্গে দুবার দেখা হয়েছিল।

প্রথমবার পেগু শহরেই। হঠাৎ রাস্তায় দেখা হতেই ছেলেটি নমস্কার করে এসে সামনে দাঁড়াল। চিনতে এক মুহূর্ত দেরি হল। গায়ে নামাবলী। হাতে গামছা। পায়ে খড়ম। হেসে বলেছিল, 'এখন আর কাঠের গোলায় নেই, দাঠাকুর। বামুনের ছেলে, আপনার আশীর্বাদে পুজো-আচ্ছা করেই এখন বেশ চলে যাচ্ছে। তাছাড়া এ জায়গায় পুরুতেরও এতদিন খুব অভাব ছিল।'

শরৎচন্দ্র শুনে খুশি হয়ে বলেছিলেন, 'তা ভালোই হয়েছে। জাত আর ভাত—দুকুলই রক্ষা হল।'

কিন্তু তার অনেকদিন পরে ছেলেটির সঙ্গে উত্তর বর্মার এক দুর্গম অঞ্চলে দ্বিতীয়বার যখন দেখা হল, শরৎচন্দ্র একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন।

পরনে ময়লা লুঙ্গি, গায়ে একটা দুর্গন্ধ ছেঁড়া গেঞ্জি। গলায় তক্তি। একমুখ দাড়িগোঁফ। 'দাদাঠাকুর' বলে চেঁচিয়ে না ডাকলে চক্কোত্তিকে চিনতে পারা দুঃসাধ্য হত।

শরৎচন্দ্র গলা নামিয়ে জিগগেস করলেন, 'নামাবলী ছেড়ে কবে আবার এ ভেক ধরলে? কী ব্যাপার, পেছনে পুলিশ লেগেছে নাকি?'

চক্কোত্তি হো-হো করে হেসে উঠে জানিয়ে দিল সেরকম কোনো সন্দেহ করবার কারণ নেই। আসলে জাতটাই সে পাল্টে ফেলেছে।

তারপর সংক্ষেপে সে তার জাত বদলের কাহিনীটা গড়গড় করে বলে গেল।

'ঠাকুরদেবতার ওপর লোকের কি আর আগের মতো ভক্তি আছে, দাদাঠাকুর? সবাই চায় নমো-নমো করে সারতে। তাছাড়া কিছুদিন যেতেই আরও একজন পুরুত এসে জুটে গেল। আমার যাও বা একটু পসার ছিল, সে এসে পড়ায় একেবারে মাটি হল। লোকটা এমনিতে পাজীর পাঝাড়া, কিন্তু খুব গোলগাল সাত্ত্বিক চেহারা। কাজেই তার সঙ্গে আমি পেরে উঠলুম না। শেষ পর্যন্ত পেগু শহর থেকে আমাকে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে আসতে হল।'

একটু দম নিয়ে চক্কোত্তি আবার শুরু করল।—

'কপাল ঠুকে তো এখানে চলে এলুম। হাতের টাকাগুলো আস্তে-আস্তে ফুরিয়ে গেল, কোনোরকম কাজই জোটাতে পারলুম না। তারপর একদিন—ঐ যে কশাইখানাটা দেখছেন—ওর মালিককে গিয়ে ধরলুম: বড় মিঞা, আমার একটা কাজ জুটিয়ে দাও। বড় মিঞা লোক বড় ভালো ছিল। বলল, আমার একজন বিশ্বাসী লোকের দরকার—তা তুমি কি এসব কাজ পারবে? আমি তক্ষুনি রাজী হয়ে গেলুম। ভাবলুম, আগে পেটে খাই, পরে জাতের কথা ভাবব। কিন্তু বড় মিঞা ভাববার আর সময় দিল না। একদিন পট করে মরে গেল। আমি তো মহা ফাঁপরে পড়লুম। এদিকে দোকানে দেখাশুনো করা আর ওদিকে মিঞার বিবিকে দেখাশুনো করা। মিঞার বাড়িতে না থাকলে দুদিক সামলানো যাচ্ছিল না। বাড়ি আর দোকান একই জায়গায় কিনা! শেষটায় অনেক ভেবে চিন্তে একদিন কল্‌মা পড়ে মিঞার বিবিকে নিকে করে ফেললুম। বিবির বয়সটাও ছিল নেহাত কম। এখন দাদাঠাকুর, আপনার

আশীর্বাদে ভালোই আছি। দোকানটা থেকে বেশ ভালোমতোই রোজগার হচ্ছে। তবে মাঝে-মাঝে ঐ জাতটার কথা ভেবে একটু যা দুঃখু হয়। কিন্তু জাত যার যার নিজের কাছে—কী বলেন, দাদাঠাকুর ?'

শরৎচন্দ্র হুঁ-হাঁ করে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চান। চক্কোত্তিরও দোকানের তাড়া। বলে, 'তাহলে চলি, দাদাঠাকুর। একদিন যদি পায়ের ধুলো দেন, বড্ড খুশি হব।'

'যদি এখানে থাকি তো নিশ্চয় যাবো একদিন।'

পেগুতে ছ মাসের বেশি মন টিঁকল না।

শরৎচন্দ্র আবার রেঙুনে ফিরে এলেন। মেসোমশাই মারা যাওয়ায় শহরে তাঁর স্থায়ী কোনো আস্তানা ছিল না। চাকরিবাকরি নেই। কাজেই নিজে বাসা করে থাকা সম্ভবই নয়। আজ এ-বন্ধুর বাড়ি, কাল ও-বন্ধুর বাড়ি, এমনি করে বেদের টোল ফেলে বেড়ানো।

শেষ পর্যন্ত গানের গলার দৌলতে ডি-এ-জি আপিসে যা হোক একটা কেরানীর কাজ জুটে গেল।

কাজটা করে দিলেন মণি মিত্তির। গিরীনবাবুই তাঁকে বলেছিলেন।

মণিবাবু ছিলেন গানের ভক্ত। আর শরৎচন্দ্রের তখন গায়ক হিসেবে রেঙুনে খুব নামডাক।

কবি নবীন সেনের সম্বর্ধনা সভায় শরৎচন্দ্রের গান শোনবার পর শুধু মণিবাবু কেন রেঙুনের সমস্ত হোমরাচোমরা ব্যক্তিই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করার জন্যে ব্যগ্র হয়েছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র গান গাইবার পরই সভা থেকে উধাও।

লোকজনের উৎসুক দৃষ্টি একেবারেই তাঁর সয় না।

৪

রেঙ্গুন শহর থেকে মাইল দুই দূরে লোয়ার পোজনডং অঞ্চল।

চারদিকে সারিবদ্ধ কাঠের দোতলা ব্যারাকবাড়ি। ধানকল, করাতকল, ডক, ঢালাই কারখানার মিস্ত্রী-ফিটার-বাইস্‌ম্যানদের বসতি।

নানা দেশের নানা জাতের মানুষদের মিলিয়ে সে এক বিচিত্র উপনিবেশ।

সামনে উন্মুক্ত মাঠ। অদূরে ইরাবতী নদী।

চাকরি পাবার পর এখানে ছোট্ট একটি কাঠের বাড়ির দোতলায় শরৎচন্দ্র ঘর ভাড়া নিলেন।

কালিঝুলিমাখা মানুষদের ভিড়ে প্রথম-প্রথম একটু খাপছাড়া দেখালেও দুদিনেই তিনি তাদের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেলেন যে, সকলেই তাঁকে আপনার জন বলেই মেনে নিল।

অসুখ করলে সকলেই তাঁর কাছে ছুটে আসে। তাঁর ওষুধে রোগ সারে অথচ এক পয়সা খরচ নেই। বাড়িতে চিঠিপত্র লিখতে হবে, যাও 'বামুনদাদা'র কাছে যাও। ছুটির দরখাস্ত দিতে হবে, যাও 'দাদাঠাকুরে'র কাছ থেকে লিখিয়ে আনো। তাঁর সঙ্গে যুক্তি পরামর্শ না করে কেউ কোনো কাজে হাত দেবে না। টাকাকড়ি লেনদেনের ব্যাপারও হবে তাঁরই হাত দিয়ে। ঝগড়াবিবাদে সবাই তাঁকে সালিশ মানবে। ঘরের বৌ-ঝিরাও তাদের মনের সমস্ত কথা অকপটে তাঁর কাছে বলবে।

এমনিভাবে ভরসা আর ভালোবাসা দিয়ে এই বিরাট এলাকার মানুষদের তিনি জয় করেছিলেন।

গিরীনবাবু তাই এই এলাকার নাম দিয়েছিলেন 'শরৎ পল্লী'।

ছুটির দিন। সন্ধ্যে হয়-হয়।

দোতলার ঘরে ঢুকে যোগেন্দ্রনাথ সরকার সত্যিই মুগ্ধ হলেন। ঘরের সামনে খোলা বারান্দা। দূরে ইরাবতীর জলে যেন মুখ দেখছে পশ্চিমের লাল আকাশ। ভেসে আসছে সিক্ত স্নিগ্ধ হাওয়া। বারান্দার এককোণে মাটির টবে ফুল, তার পাশে তুলসী। ঘরের ভেতরে এককোণে একটা কাঠের সিন্দুক। তার পাশে জলের কুঁজো, গ্লাস, স্টোভ আর টুকিটাকি জিনিসপত্র। দেয়ালে সুন্দর-সুন্দর কয়েকটা ক্যালেণ্ডার আর রবীন্দ্রনাথের ছবি। এক পাশে একটা ইজিচেয়ার, একটা বিরাট গড়গড়া। ছোট্ট টেবিলের ওপর কয়েকটা মোটামোটা বই, মাসিকপত্র, খাতা-কলম-কাগজ। একপাশে ছবিআঁকার সরঞ্জাম। শাদাসিধে একটা বিছানা।

শরৎচন্দ্র হেসে জিগ্‌গ্যেস করলেন, 'কী দেখছ, যোগীন ? বসো।'

যোগেনবাবু বসবার পর শরৎচন্দ্র ইজেলের ওপর থেকে ঢাকনাটা সরিয়ে দিলেন।

যোগেনবাবু চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছেন না। এতো নিছক শখের ছবি আঁকা নয়। রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে এক অপূর্ব সৃষ্টি। আলোছায়ার কী সূক্ষ্ম পরিমাণবোধ!

'বাঃ কী সুন্দর! তুমি যে এমন আঁকতে পারো, তা তো জানতাম না, শরৎদা!'

আরও একটা ছবি: 'মহাশ্বেতা'। বর্ষায় অচ্ছোদ তীর ঝাপ্‌সা। দূরে অস্পষ্টতর মেঘভারাবনত আকাশ। একপাশে মেঘের অবগুণ্ঠন সরিয়ে উঁকি দিচ্ছে লাজুক সূর্য। নদীতীরে একটি গাছের নিচে এলোকেশে সদ্যস্নাতা তপস্বিনী মহাশ্বেতা। যেন রোরুদ্যমানা প্রকৃতির একটি জীবন্ত আলেখ্য।

সব ছবিতে মানুষই প্রধান। মানুষকে রূপায়িত করার জন্যেই ডাক পড়েছে প্রকৃতির!

শরৎচন্দ্র বললেন, 'যারা শুধু নিসর্গচিত্র আঁকে, আমি তাদের মোটেই বড় বলি না। মানুষের ছবি আঁকতে পারাই হল আসল শিল্পীর লক্ষণ। আমি নেহাত আনাড়ির মতো কথাটা বলছি না। শিল্পের ওপর লেখা ওদেশের বড়-বড় সমালোচকদের বই আমি পড়েছি, সেরা শিল্পীদের আঁকা ছবিও দেখেছি। তোমরা যতই রাফাইয়েল-রাফাইয়েল করো যোগীন, আমি ভাই টিসিয়ান-এর ভক্ত।'

তারপর দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবাবিষ্ট হয়ে বললেন, 'আমি চাই রঙ দিয়ে মানুষের দুঃখবেদনাকে ফোটাতে।'

তারপর ইজেলের ওপর অর্ধসমাপ্ত ছবিটা দেখিয়ে বললেন, 'ঐ যে শ্রান্তক্লান্ত ক্ষুধার্ত বুড়োটাকে দেখছ, ও আমার সেই আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। সারাদিনের পথশ্রমে পুকুরের পাড়ে গাছের তলায় ও ঢলে পড়েছে। দূরে এঁকেবেঁকে গেছে পায়ে-চলা রাস্তা। ওর স্পন্দবিহীন আশাহত শরীরে পথের ধুলো, ঠোঁটের কোণে যেন অস্ফুট হরিনামের ধ্বনি। একটু আশা, একটু অব্যক্ত কামনা। বুড়ো আমার মনগড়া নয়। এখুনি এসে পড়বে।...'

কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। দরজা ঠেলে কাশতে-কাশতে ভেতরে ঢুকল এক জীর্ণ শীর্ণ বুড়ো। শরৎচন্দ্রের নাম-দেওয়া 'নারদ'।

শরৎচন্দ্র বললেন, 'তুমি অনেকদিন বাঁচবে, নারদ। এক্ষুনি তোমার নাম করছিলাম।'

কপট রাগ দেখিয়ে বুড়ো বলল, 'দেব্‌তা, তোমার কোন পাকা ধানে আমি মই দিয়েছি যে, তুমি আমাকে আরও বাঁচতে বলছ?'

মেঝের ওপর বুড়ো বসতে যাচ্ছিল, শরৎচন্দ্র তাকে ধরে ইজিচেয়ারে বসালেন। তারপর একথালা খাবার তার হাতে এগিয়ে দিয়ে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে আনলেন। তারপর সস্নেহে বললেন, 'কই, খেয়ে নাও শিগগির। আজ এখুনি আঁকতে বসব।'

বুড়ো মুখে কিন্তু-কিন্তু ভাব নিয়ে একবার যোগেনবাবুর দিকে

তাকাল। শরৎচন্দ্র হেসে বললেন, 'ও আমার আপিসের বন্ধু যোগেন। খুব ভালো লোক। আর যোগেন, এ আমার মডেল—এ যুগের নারদমুনি।'

যোগেনবাবু নমস্কার করে উঠে পড়লেন।

'তুমি ছবি আঁকো, শরৎদা। আমি এখন চলি। ছবিটা শেষ হলে খবর দিও কিন্তু।'

অন্যমনস্ক হয়ে শরৎচন্দ্র বললেন, 'আচ্ছা।' বন্ধুকে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেবার কথাও তিনি ভুলে গেছেন। চোখের সামনে শুধু বুড়োর মুখ। রঙ আর রেখা। আলো আর ছায়া। মানুষের ব্যথা আর বেদনা।

৫

রামকৃষ্ণ মঠের স্বামীজীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আলোচনা চলছিল।

'আচ্ছা স্বামীজী, কর্মফলে যদি অদৃষ্টবাদ অনিবার্য হয়ে ওঠে, তবে পুরুষকার ছেড়ে ঈশ্বরের আরাধনা, জপতপ করতে যাই কেন?'

প্রশান্ত গলায় স্বামীজী বললেন, 'দেখ বাবা, পুরুষকারও তো দৈবশক্তি ছাড়া কিছু নয়। দৈবের আরাধনায়ও পুরুষকার দরকার। যেখানে রোগ সেখানেই ওষুধ, যেখানে অন্ধকার সেখানেই আলো, যেখানে ধর্মগ্লানি সেখানেই ধর্মসংস্থাপন…'

'আমি কি তবে নাস্তিক, স্বামীজী?'

'না বাবা,' স্নিগ্ধ হেসে স্বামীজী বললেন, 'যারা নাস্তিক তারাই বেশি করে ঈশ্বরকে খুঁজছে। জগৎ যখন আছে, তখন তার স্রষ্টিকর্তাও নিশ্চয় আছে।'

'যদি স্বভাবকে জগতের কারণ বলি?'

'স্বভাবের উৎপত্তির কারণকে তবে ঈশ্বর বলতে পারো।'

'স্বভাবের কারণ যদি ঈশ্বর হন, তবে তাঁর কারণ কে?'

'ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি স্বভাবের কারণ; ইচ্ছাশক্তির মালিক স্বয়ং ভগবান।'

'আপনাদের মঠের সন্ন্যাসী হবার নিয়ম কী?'

'প্রথম তিন বছর শিক্ষানবীশী, পরের তিন বছর ব্রহ্মচর্য। পরে মঠাধ্যক্ষ উপযুক্ত মনে করলে সন্ন্যাস দেন। মঠের সন্ন্যাসীদের আদর্শ ত্যাগী, আদর্শ সংযমী, আদর্শ ভক্ত হতে হয়।'

'তার মানে, ছ বছর অ্যাপ্রেন্টিস্। ছ বছর মেডিকেল কলেজে পড়লে ডাক্তার হওয়া যায়। তাতে বরং মানুষের খানিকটা সেবা করা যায়।'

'তা হয়তো যায়, বাবা ; কিন্তু আসক্তিহীন না হলে আবার সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়া যায় না।'

মাথায় একরাশ ভাবনা নিয়ে শরৎচন্দ্র উঠে এলেন।

তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর আজও মেলেনি। বার্ণার্ড ফ্রী লাইব্রেরী থেকে এনেছেন তিনি জন স্টুয়ার্ট মিল, হার্বার্ট স্পেন্সার, কোঁৎ-এর বই। রাজনীতি, মনোবিজ্ঞান, সমাজনীতি, দর্শন—জ্ঞানবিজ্ঞানের সমস্ত বিভাগেই তাঁর কৌতূহল।

সমস্ত কিছু ত্যাগ করতে হবে! কথাটা সেই থেকে মনের মধ্যে ঘুরছে। গভীর থেকে গভীরতর হল রাত। তবু ঘুম এল না।

সমস্ত কিছু ত্যাগ করতে হবে! কিন্তু যাদের সবাই ত্যাগ করেছে, সেই দরিদ্র, অজ্ঞ, সরল, হতভাগ্য মানুষদের ? যারা এই এঁদোগলির বাসিন্দা ?

না। মানুষকে ছেড়ে যাওয়া চলে না। যাদের কথা কেউ কোনোদিন বলেনি, যারা সারাজীবন ধরে শুধু দেয় কিন্তু নিজেরা পায় না, সমাজ যাদের শেষ রক্তবিন্দু শুষে নেয়—মানুষের মতো তাদের বাঁচবার অধিকার দাবি করতে হবে।

রাতটা কেটে যায় যেন নেশার ঘোরে। চেনা মুখগুলো অন্ধকারে মিছিল করে ঘরে আসে। হঠাৎ জীবনের সমস্ত শূন্যতা ভরে যায়। ফোয়ারার মতো বেরোয় শব্দ। তারপর নেচে-নেচে চলে কথার নদী। রুক্ষ মাটিকে উর্বর করে তোলে।

সকালে ডাকে এল 'ভারতী' পত্রিকা। কী আশ্চর্য! লেখা বেরিয়েছে। 'বড়দিদি'। লেখকের নাম নেই। কিস্তিতে-কিস্তিতে লেখাটা বেরোবে। ছেলেবয়েসের লেখা। এ নিশ্চয় সুরেন-মামার কাণ্ড।

কিন্তু একবার তো অনুমতি নিতে পারত! পই-পই করে তাকে বলা

আছে, তার কাছে গচ্ছিত লেখাগুলো এক 'প্রবাসী' ছাড়া অন্য কোথাও ছাপাতে দিলে যেন একবার অনুমতি নিয়ে নেয়।

সুরেনমামার চিঠিতে সব পরিষ্কার হল। লেখাটা 'প্রবাসী'তেই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু 'প্রবাসী' ছাপতে না পারায় সেটা সরলাদেবীর হাতে যায়। তিনিই উৎসাহী হয়ে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের মারফত লেখাটা 'ভারতী'তে ছাপাবার ব্যবস্থা করেন।

দু সংখ্যায় ছাপা হয়ে বেরোতেই পাঠকদের মধ্যে রীতিমতো সোরগোল পড়ে গেল। কে এই অসামান্য লেখক? অনেকে মনে করল, এ লেখা রবি ঠাকুরের না হয়ে যায় না। কিন্তু সব অনুমান ভুল প্রমাণ করে তৃতীয় এবং শেষ কিস্তিতে এক অপরিচিত নাম ছাপা হল —শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাংলার পাঠকসমাজ সেই আশ্চর্য নতুন লেখককে দুহাত তুলে স্বাগত জানাল।

শরৎচন্দ্রের চিঠির ঝুলি ক্রমেই ভারি হয়ে উঠছে। বন্ধুবান্ধব, কাগজের সম্পাদক, অপরিচিত গুণমুগ্ধ পাঠক—সকলেই চাইছে তিনি আরও লিখুন। লেখার জন্যে তাগাদার ওপর তাগাদা আসছে।

ভেতর-বাইরের এই মিলিত তাগিদে অনেকদিন পর শরৎচন্দ্র আবার কলম ধরলেন।

এবার আর সেই পুরনো ঢঙে লেখা নয়। একেবারে নতুন করে গোড়া বেঁধে লেখা।

লেখার সময় কোনো বাহ্যজ্ঞানই তাঁর থাকে না। যাদের নিয়ে লেখেন তারা জীবন্ত হয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। দেশকালের সমস্ত ব্যবধান মুছে যায়।

বাইরে জোরে-জোরে কড়া নাড়ার শব্দ। শুনে মনে হল অনেকক্ষণ থেকে কেউ ডাকছে।

চমকটা ভাঙতে একটু সময় লাগল।

শরৎচন্দ্র সাড়া দিলেন—'কে?'

'আমি পাঁচকড়ি।'

'ও, মিস্টার ফ্রেণ্ড! আসুন, আসুন—দরজা খোলা আছে।'

পাঁচকড়িবাবুর নাম 'মিস্টার ফ্রেণ্ড' হবার ছোট্ট একটা ইতিহাস আছে। রেঙুনে উনি নবাগত। বাড়ি কলকাতায়। সংসারে বুড়ি মা আর ছোট ভাই। এদেশে ওঁর একা ভাগ্যান্বেষণে আসা।

মিস্টার ব্যানার্জী বলে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে রেঙুনে আসার পথে তাঁর জাহাজে আলাপ হয়। মিস্টার ব্যানার্জী ধনীর ঘরের দুলাল। স্বভাবটাও দিলদরাজ। পরিচয়ের পর বললেন, 'বেশ তো, চলুন আপনি আমাদের সঙ্গে উঠবেন। আমরা স্বামী-স্ত্রী, দেশ দেখতে বেরিয়েছি। আপনাকে সঙ্গী পেলে সময়টা ভালোই কাটবে।' পাঁচকড়িবাবু যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। বিদেশ-বিভুঁইতে চাকরির সন্ধানে এসে এমন ভাগ্য কজনের হয়! তাছাড়া ভদ্রলোকের স্ত্রী গায়ত্রী দেখতেও যেমন সুন্দর ব্যবহারও তাঁর তেমনি মনোরম। কাজেই পাঁচকড়িবাবু এক কথাতেই রাজী।

কুঞ্জবাবুর বাড়িতে এসে ওঁরা উঠলেন। রেঙুনে এমন অতিথিবৎসল মানুষ খুব কম। আইন-ব্যবসায়ী হিসাবে তাঁর যেমন নাম তেমনি রোজগার। কাজেই আদর-আপ্যায়নে কোনো ত্রুটি হল না।

গিরীনবাবুর সঙ্গে একদিন বেড়াতে গিয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ওঁদের আলাপ হল।

মিস্টার ব্যানার্জী যতই ঢাকবার চেষ্টা করুন, শরৎচন্দ্রের চোখকে ফাঁকি দিতে পারেননি। শরৎচন্দ্র মানুষ দেখেছেন অনেক। কোনটা মুখ আর কোনটা মুখোশ—দেখলেই তিনি ধরে ফেলতে পারেন।

কুঞ্জবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে শরৎচন্দ্র মিস্টার ব্যানার্জী আর পাঁচকড়িবাবুর নাম দিলেন 'মিস্টার হাজব্যাণ্ড' আর 'মিস্টার ফ্রেণ্ড'।

সন্দেহের কথাটা খুলে না বলে নামের ভেতর দিয়ে শুধু একটু ছুঁইয়ে রাখলেন।

দিন কয়েক পরেই শোনা গেল, কুঞ্জবাবুর চোখেও ওদের চালচলনটা ভালো ঠেকছে না। উনি চান ওরা অন্য কোথাও উঠে যায়।

অগতির গতি গিরীন্দ্রনাথ। তিনি এসে ধরলেন, 'শরৎদা, তোমাদের এই পাড়াতেই ওদের জন্যে একটা বাসা খুঁজে দাও। তারপর আসল ব্যাপারটাও জেনে নিতে হবে। ভালো মুশকিলে পড়া গেছে যা হোক।'

বাসা পেতে দেরি হল না। মিস্টার হাজব্যাণ্ড, গায়ত্রী আর মিস্টার ফ্রেণ্ড সেই থেকে এই নতুন বাসাতেই আছেন।

পাঁচকড়িবাবু দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন।

'কী খবর? এত রাত্তিরে!'

পাঁচকড়িবাবু উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, 'শিগগিরই একবার চলুন। একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেছে।'

'মিস্টার হাজব্যাণ্ড?'

'হ্যাঁ।'

জুতোটা পরতে-পরতে শরৎচন্দ্র বললেন, 'এতদিন আপনি কি চোখে ঠুলি দিয়ে ছিলেন, মিস্টার ফ্রেণ্ড?'

পাঁচকড়িবাবু বললেন, 'সত্যি বলছি, নতুন বাড়িতে আসার আগে আমার কোনোদিন কিছু মনে হয়নি। ওঁদের সঙ্গে থাকতামই বা কতক্ষণ? সারাদিনই তো চাকরির ধান্ধায় আমাকে ঘুরে বেড়াতে হয়।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে শরৎচন্দ্র বললেন, 'গিরীন আর নিবারণ-বাবুকে একবার ডাকা দরকার।'

পাঁচকড়িবাবু বললেন, 'ওঁদের কাছে লোক পাঠিয়েছি। ওঁরাও এসে পড়বেন।···কিন্তু ঘরে আপনি তালা দিলেন না তো ?'

শরৎচন্দ্র হেসে বললেন, 'ও আমার কুষ্ঠিতে লেখা নেই। আমার ঘরে চুরি করতে চোরদেরও মায়া হয়।'

রাস্তায় যেতে-যেতে পাঁচকড়িরবাবুর কাছে জানা গেল, নতুন বাড়িতে এসে পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটা তাঁর কেমন যেন রহস্যজনক মনে হচ্ছিল। এ বাড়িতে দেখা গেল, মিস্টার ব্যানার্জী আর গায়ত্রী দুজনে দুটো আলাদা ঘরে থাকছে। হঠাৎ কানে এল গায়ত্রী মিস্টার ব্যানার্জীকে 'আপনি' বলছে। আর শুধু তাই নয়, পরনেও নিয়েছে বৈধব্যের সাজ! ব্যাপারগুলো বেশ একটু অস্বাভাবিক ঠেকেছিল। কিন্তু বড়লোকের উট্‌কো প্রগতির বিচিত্র খেয়ালের ব্যাপার মনে করে ও নিয়ে তিনি তখন মাথা ঘামাননি।

কিন্তু ব্যাপারটা চরমে উঠেছে আজ। পাঁচকড়িবাবুকে লোক দিয়ে ডেকে পাঠিয়ে কুঞ্জবাবু একটা চিঠি দেখালেন। ব্যানার্জীর মা লিখেছেন। তাতে জানা যায়—ব্যানার্জী বড়লোকের ছেলে। বাপ অনেক টাকা রেখে গেছে। বসে-বসে খায়। কাছেই গায়ত্রীদের বাড়ি। অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিল গায়ত্রী। বুড়ো বাপের কাছে থাকত। গায়ত্রীর নিজের মা নেই, সৎমা। দিনরাত উঠতে-বসতে নাকের জলে চোখের জলে করত তাকে। হঠাৎ একদিন ব্যানার্জীর রেঙুন দেখার শখ চাপল। তার রেঙুনের জাহাজ ছাড়ার রাত থেকে গায়ত্রীও এদিকে নিরুদ্দেশ! কদিন ধরে কোথাও তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। লোকে তাঁর ছেলেকেই সন্দেহ করছে। তাই ফিরতি ডাকে জবাব চেয়েছেন ব্যানার্জীর মা।

শুনে গুম্ হয়ে গেলেন শরৎচন্দ্র। জিগগেস করলেন, 'ব্যানার্জী কোথায় ?'

'যাবে আর কোন চুলোয় ? ঘরেই আছে।'

ব্যানার্জীর ঘরে ব্যানার্জীকে পাওয়া গেল না। গায়ত্রীর ঘর ভেতর থেকে বন্ধ।

ঘরের ভেতর থেকে উত্তেজিত কথাবার্তার আওয়াজ আসছিল।

শরৎচন্দ্র দরজায় কান রাখলেন।

'হাত ছাড়ুন, ছাড়ুন বলচি শিগগির, আপনার মতলব আমি বুঝে ফেলেছি।'

'কেন আমার ওপর রাগ করছ, গায়ত্রী ? তোমার এই বিধবার সাজ আমার ভালো লাগে না।'

'ভালো লাগে বুঝি একটা অসহায় গেরস্তোর মেয়েকে ভুলিয়ে ঘরের বার করে আনতে ? ভালো লাগে বুঝি দরদী সেজে লক্ষ্ণৌতে তার মেশোমশায়ের বাড়ি পৌঁছে দেবার নাম করে এই মগের মুল্লুকে এনে খেলার পুতুলের মতো খুশিমাফিক নাচাতে···?'

উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগল গায়ত্রী।

'এ তুমি কী বলছ, গায়ত্রী ? তোমাকে আমি চিরদিন মাথায় করে রাখব। স্ত্রীর চেয়েও তোমাকে আমি বেশি ভালোবাসব।'

গায়ত্রী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, 'অসভ্য, ইতর, জানোয়ার !···সরে যাও আমার সামনে থেকে। কপাল তো পুড়িয়েইছি, তোমার হাতে আর আমার শেষ সর্বনাশ হতে দেব না।'

তারপর একটা ধ্বস্তাধ্বস্তির আওয়াজ। ব্যানার্জী মরীয়া হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ দরজায় জোরে-জোরে ঘা পড়ল। বোঝা গেল জানোয়ারটা ভয় পেয়েছে।

খুট করে দরজাটা খুলে ব্যানার্জী স্বাভাবিক ভাব দেখাবার চেষ্টা করল। বিরক্তির সঙ্গে জিগগেস করল, 'কী চাই ?'

ততক্ষণে গিরীনবাবু আর নিবারণবাবুও এসে পড়েছেন।

শরৎচন্দ্র আদেশের ভঙ্গিতে বললেন, 'বেরিয়ে এসো। কথা আছে।'

ব্যানার্জী হঠাৎ ভীষণ ঘাবড়ে গেল। তার সেই উদ্ধত ভঙ্গি আর নেই।

চোরের মতো গুটি-গুটি বাইরে এসে দাঁড়াল। ভয়ে মুখ তার শুকিয়ে গেছে।

শরৎচন্দ্র বললেন, 'আর একঘণ্টা সময়। এই জাহাজেই তোমাকে এদেশ ছাড়তে হবে।'

ব্যানার্জী মুখ নিচু করে থাকল।

শুধু একবার বলবার চেষ্টা করল, 'গায়ত্রী ?'

শরৎচন্দ্র চোখে আগুন ঠিকরে বললেন, 'জানোয়ারের হাতে মানুষের ভার দেওয়া যায় না। তুমি যাও, ওকে পাঠাবার অন্য বন্দোবস্ত হবে।'

৬

পাঁচকড়িবাবু ওরফে মিস্টার ফ্রেণ্ডকে বলে-কয়ে এ-বাড়িতে থাকতে রাজী করানো গেল। নইলে গায়ত্রীকে কে দেখবে?

শরৎচন্দ্র পাঁচকড়িবাবুকে কথা দিলেন রোজ রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে এসে তাঁর ঘরে ঘুমোবেন। পাঁচকড়িবাবুর ভয়, রাত্রে একা থাকলে পাছে লোকনিন্দে হয়।

সে কথা রাখা ছাড়াও শরৎচন্দ্র গায়ত্রীর ঘরসংসারের কাজের জন্যে একটা ঠিকে ঝি রাখার বন্দোবস্ত করলেন। যখন যেটা দরকার জানতে পারলে শরৎচন্দ্রই তা জুটিয়ে এনে দেন।

তা হলেও শরৎচন্দ্রের তো আপিসের সামান্য চাকরি। যা মাইনে পান, তাতে নিজেরই কুলোয় না। খাওয়া-দাওয়ারও কোনো নিয়মিত ব্যবস্থা নেই। কোনোদিন নিজে রেঁধে খান, কোনোদিন হোটেলে, আবার কোনোদিন হয়তো মুড়ি-মুড়কি খেয়েই দিন কাটান। তার ওপর আপিসও নেহাত কাছেপিঠে নয়।

গায়ত্রী এই আত্মভোলা মানুষটাকে দেখে অবাক হয়। খেয়ে, না-খেয়ে, রোজ মাইলের পর মাইল হেঁটে, এত দুঃখকষ্টের মধ্যেও কী করে মানুষটার মুখে সমস্তক্ষণ হাসি লেগে থাকে! নিজে ঘর বাঁধেনি, অথচ পরকে সুখী করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা তার। গায়ত্রীর চোখে জল আসে।

এদিকে পাঁচকড়িবাবু আপিসের দুয়োরে-দুয়োরে ধরণা দিয়ে এতদিনেও একটা কাজ জোটাতে পারলেন না। সঙ্গে যা এনেছিলেন, তাও ফুরিয়ে গেল। শেষকালে গলার হার বেচে গায়ত্রীকে বাড়িভাড়ার টাকা মেটাতে হল। সংসারের ত্রাহি-ত্রাহি অবস্থা।

এমনি সময় ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। পাঁচকড়িবাবু এক কাঠের গোলায় পঞ্চাশ টাকা মাইনের একটা ছোটখাটো কাজ পেলেন। যাহোক এখন কোনোরকমে ছুটো ডাল-ভাত জুটবে।

অনেকদিন এবাড়িতে শরৎচন্দ্রের পায়ের ধুলো পড়েনি। তাঁর গলার গান কতদিন যে শোনা হয়নি! গায়ত্রী এতদিনে মানুষটাকে চিনে নিয়েছে। দারুণ খেয়ালী। এখন নাকি সারাক্ষণ বসে-বসে ছবি আঁকছেন। রোগীর বাড়িতে ছাড়া আর কোথাও এখন তিনি যান না। গায়ত্রী তবু তাঁকে ক্ষমা করতে পারে না। দিনের মধ্যে একবারও ছোটবোনের একটু খবর নিতে পারা যায় না, এতই কি কাজ?

শরৎচন্দ্র বিকেলের দিকে রাস্তায় একটু পায়চারি করে ফিরছিলেন। হঠাৎ পায়ের কাছে গড় হয়ে পড়ল আঁটোসাঁটো বাঁধুনির এক স্ত্রীলোক।

'পেন্নাম হইগো দাদাবাবু। ভালো আছেন তো?'

গলার স্বরেই তাকে চেনা গেল। শরৎচন্দ্র হেসে জিগগেস করলেন, 'তোর কী খবর রে, কামিনী? অনেকদিন দেখিনি।'

'আপনার আশীর্বাদে ভালোই আছি, দাদাবাবু।' হাসতে গিয়ে কেন যেন কামিনীর চোখে জল এসে গেল।

একটু থেমে শরৎচন্দ্র জিগগেস করলেন, 'তা আবার তাহলে তুই ঘর বাঁধলি, কামিনী?'

লজ্জাকুণ্ঠায় জড়িয়ে-জড়িয়ে কতকটা যেন কৈফিয়তের মতো কামিনী জবাব দিল, 'কী করি, দাদাবাবু?...হেঁ—হেঁ, তা এবারের ইনি কিন্তু তেনারই মামাতো ভাই। পরিচয় ছেলো, দুঃখের দিনে খাওয়ালে-পরালে খোঁজখবর নেলে। এদানি বড্ড কষ্টে পড়েছেলো মানুষটা—ছু-ছুটো মা-খেকো এঁতুড়ে ছেলে...আহা।'

'বটে!'

'হ্যাঁ, দাদাবাবু। তাই না আবার আমায় নতুন করে সংসার পাততে হল। তবে মানুষটা কিন্তু বড্ড ভালো—ঠিক তেনার মতো। আদর করে, ভালোবাসে, নেশাভাঙ করে না।'

'বটে! তা হ্যাঁরে, কামিনী—এর নাম নিবারণ না?'

'আপনি তো জানেন, দাদাবাবু।' মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে কামিনী বলল, 'একদিন পায়ের ধুলো দেবেন বাড়িতে।'

কামিনী চলে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে পেছন থেকে গিরীনবাবু এসে শরৎচন্দ্রকে ধরে ফেললেন।

'আমি তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম, শরৎদা।...আচ্ছা, এই সেদিন ঐ মেয়েটার স্বামীর তুমি চিকিৎসা করেছিলে না? মাগী আবার বিয়ে করেছে? সিঁথিতে সিঁদুর দেখলাম!'

শরৎচন্দ্র কি যেন ভাবছিলেন। ভাবতে-ভাবতেই বললেন, 'দেখ গিরীন, দূর থেকে মানুষকে ভুল বোঝা খুবই সহজ। আমি মানুষকে কাছ থেকে দেখেছি। মেয়েদের নীড়বাঁধার টান যে কী জিনিস, তা তো তুমি জানো না। ওর প্রথম স্বামী যখন মারা গেল, ওর পাঁজর যেন খসে গিয়েছিল। খেতে পারত না, ঘুমোতে পারত না, সারাক্ষণ ছটফট করত। কিন্তু নীড় বাঁধার স্বপ্ন নিয়ে তার জীবনে দ্বিতীয় মানুষ যখন এল, তাকেও সে সমানভাবেই ভালোবাসল। এর মধ্যে কোনো ফাঁকি নেই, গিরীন। তুমি কী বলবে, জানি না—'

গিরীনবাবু লজ্জিত হলেন। কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ, শরৎদা। মানুষকে আমরা দূর থেকে দেখি। তাই ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।' একটু থেমে তারপর বললেন,'হ্যাঁ, তোমার কাছে যে জন্যে যাচ্ছিলাম। গায়ত্রী-মাকে নিয়ে কী করি বলো তো?'

'আমাকে আর জ্বালিও না, গিরীন। আমাকে ছুটি দাও।' শরৎচন্দ্রের কণ্ঠস্বরে ক্লান্তি।

'ভাবতে-ভাবতে এদিকে আমি যে ঘুমোতে পারছি না, শরৎদা।

পাঁচকড়িবাবু ছিলেন, একটা ভরসা ছিল। তিনিও তো মায়ের অসুখের খবর পেয়ে কলকাতায় চলে গেছেন। গায়ত্রী একেবারে একা। শহরে দুষ্টু লোকের তো অভাব নেই।'

'তার আমি কী করব, গিরীন! এসব ঝঞ্ঝাট আর আমি ঘাড়ে নিতে পারছি না।'

'তুমিও এই কথা বলছ, শরৎদা? তাহলে বরং মেয়েটাকে বলে দাও গলায় কলসী বেঁধে ডুবে মরতে। তাতে ওর সম্ভ্রমটা অন্তত বাঁচবে। ওর বাবাও ওকে তাই লিখেছেন।'

শরৎচন্দ্র উদ্বিগ্ন হলেন, 'বাপ এই কথা লিখেছে? আর মেসোমশাই?'

'তাঁর জবাব এখনো আসেনি।'

'আচ্ছা, তুমি যাও গিরীন। আমি দেখছি কী ব্যবস্থা করা যায়।' বলে চিন্তাক্লিষ্ট মুখে শরৎচন্দ্র বাড়ির রাস্তায় হন-হন করে এগিয়ে গেলেন।

সিঁড়িতে অর্ধেক উঠেছেন, এমন সময় নিচে থেকে মেয়েলী গলায় কে একজন ডাকল, 'একটু শুনবেন?'

শরৎচন্দ্র ঘুরে দাঁড়ালেন।

'কে? শান্তি? কী ব্যাপার?'

শাড়ির আঁচলের খুঁটটা আঙুলে জড়াতে-জড়াতে শান্তি বলল, 'বাবাকে একটিবার দেখে যাবেন?'

'শুধু-শুধু দেখে আর কী করব, শান্তি? চক্রবর্তীকে কতবার বলেছি: তুমি আর ওভাবে মদ খেয়ো না এ বয়েসে, বুড়ো ধাতে সইবে না। তা—'

'কিন্তু একা-একা আমি যে এদিকে কী করি!'—শান্তির চোখে জল। 'বাবা আমার কোনো কথা শোনে? সারারাত ধরে বাড়িতে মদের আড্ডা বসাবে আর হৈ-হল্লা করবে।'

'আচ্ছা, তুমি এখন ঘরে যাও শান্তি। আমি যাবোখন।'

শরৎচন্দ্র দরজা খুলে ভেতরে ঢোকা পর্যন্ত শান্তি সেইদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। রাস্তার খোঁদলে যেখানে আলো পড়েছে, জলের গায়ে বৃষ্টির বেলকুঁড়ি। গাছের পাতাগুলো কাঁপছে।

রাস্তায় লোক নেই। খুপরি-খুপরি কাঠের ঘরে টিমটিমে আলোয় ছায়ামূর্তিগুলো নড়ছে। মাঝে-মাঝে ভেসে আসছে মাতালদের অসংলগ্ন আলাপ। আদিরসে নিমগ্ন অন্ধকার।

গুড়-গুড় করে ডেকে উঠছে আকাশ। মাঝে-মাঝে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে বিদ্যুৎ।

গায়ত্রীদের বাড়ির দিকে পা চালাতে-চালাতে শরৎচন্দ্র ভাবলেন, এখন রাত কত কে জানে? পাঁচকড়ি চলে গেছে, গায়ত্রী বাড়িতে একদম একা। সত্যি এত রাত্তির করা উচিত হয়নি। বেচারা নিশ্চয় খুব ভয় পাচ্ছে।

ভিজে কাপড়ে দোতলার বারান্দায় এসে উঠতেই বেশমণি ছুটে এল। তার হাতে ভিজে একটা ন্যাতা। বারান্দায় জল আটকে যাওয়ায় এতক্ষণ সে জল বার করার চেষ্টা করছিল।

বেশমণি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। বলল, 'যাক, দাঠাকুর এসে গিয়েছ। বাঁচা গেছে। আমি তো ভাবছিলুম, এ দুর্যোগে তুমি আর আসতেই পারলে না। এঃ, বড্ড ভিজে গিয়েছ দেখছি।'

রুমাল দিয়ে হাত-মুখ মুছতে-মুছতে শরৎচন্দ্র জবাব দিলেন, 'না, তেমন কিছু নয়।'

গায়ত্রীর ঘরটা দেখা যাচ্ছে। ভেতর থেকে বন্ধ। শরৎচন্দ্র সেদিকে তাকিয়ে জিগগেস করলেন, 'তোর মা কি ঘুমিয়ে পড়ল নাকি রে এরি মধ্যে, কোনো সাড়াশব্দ পাচ্ছি না যে?'

'সে কথা আর আমাকে তুমি জিগগেস কোরনি, দাঠাকুর। তুমি বামুন মানুষ, বন্নছেরেষ্টো, মিথ্যে বলবুনি তোমার ঠেঙে। মা আমার সকাল থেকে উপুচ্ছেরাস্ত কাঁদতেছে, একটু জল পর্যন্ত মুখে করেনি'—এক নিঃশ্বাসে বেশমণি বলে যায়।

বেশমণি মানুষ ভালো ; কিন্তু একবার কথা বলতে আরম্ভ করলে তাকে থামানো মুশকিল। মুখের ফেনা মরলে তবে তার কাছ থেকে আসল কথাটা জানা যায়।

শরৎচন্দ্র উদ্বিগ্ন হন। গলা নামিয়ে জিগগেস করেন, 'সে কি রে, কী হয়েছে ?'

'না, এখনো কিছু হয়নি। তবে আঁশবঁটি আমি শানিয়ে রেখেচি।'

'কী সর্বনাশ ! কার জন্যে রে ?'

বেশমণি আবার ঘ্যানর-ঘ্যানর করে শুরু করে : 'না, না দাঠাকুর, আমরা ছোটনোক বটে, কিন্তু ভদ্দর নোকদের ওসব প্যাঁচোয়া ব্যাপার-স্যাপার দেখে আমাদের গায়ে জ্বালা ধরে। বলে, তিন ছেলের মা হলুম স্বামী কেমন জিনিস একবার চোখেও দেখলুম না—সেই বিত্তান্তের বিত্তান্ত। তবে হ্যাঁ, মানুষ দেখলে মানুষ চিনতে পারি। তুই আমার চোখে ধুলো দিবি ? বুকে দেঁড়িয়ে ক্যাঁত-ক্যাঁত করে নাতি মারব না ?'

শরৎচন্দ্র বিরক্ত হয়ে বলেন, 'সে তুই যাকে ইচ্ছে হয় মারিস'খন। কিন্তু কী হয়েছে, বল ?'

বেশমণির আবার সেই এক কথা : 'না, না, মাইরি বলচি দাঠাকুর, তোমার দিব্যি,. মা'র আমার গঙ্গাজলের মতো চরিত্তির। এত পেলোভন যদি হচপচে কোনো মেয়েমান্‌ষের সামনে পড়ত—'

শরৎচন্দ্র ধমক দেন, 'ফের ঐ এক কথা বলছিস। আসল ব্যাপারটা কী তাই বল্ না।'

'বলচি সেই মুখপোড়া মিন্‌সের কথা, পাঁচকড়ি দাদাবাবু যার কাঠগোলায় কাজ করত গো। সেই অলপ্পেয়েই তো আজ তার ঝি-মাগীকে দিয়ে এক থাল মিষ্টি পাঠিয়েছেল। আর একটা কাগজে কিসব কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং নিখে দিয়েছেল। মা সেই যে শয্যা নিল—'

শরৎচন্দ্র গুম হয়ে গেলেন। শুধু একটা জ্বলন্ত নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'হুঁ ! শশাঙ্কর দেখছি মরবার পাখা উঠেছে।'

বেশমণি সোৎসাহে বলল, 'আমিও অবিশ্যি ঝি-মাগীকে তক্ষুণি ঝেঁটিয়ে বিদেয় করিচি। বলিচি, ফের এলে ঠ্যাং ভেঙে দেব। কিন্তু কাল যে আবার কী হবে, দাঠাকুর!'

শরৎচন্দ্র বললেন, 'ও তুমি ভেবো না, বেশমণি। ওরা কেন্নোর জাত। একটু টোকা দিলেই ভয়ে গুটিয়ে যাবে।'

বেশমণি শুনে হাসে। বলে, 'এ তুমি ঠিক বলেছ, দাঠাকুর।'

এ ব্যাপারটা এমন কিছু নয়। কিন্তু তাহলেও এ থেকে বোঝা যাচ্ছে এভাবে একা-একা থাকা গায়ত্রীর পক্ষে নিরাপদ নয়। অথচ খোঁজ না নিলে বেচারা যাবেই বা কোথায়?

চিন্তাক্লিষ্টমুখে শরৎচন্দ্র পাশের ঘরে গেলেন। বাইরে চমকে-চমকে উঠছে বিদ্যুৎ। বাতাসও বেশ জোরে-জোরে বইতে শুরু করেছে। ঝড় উঠবে বলে মনে হয়।

রেলিঙে ভর দিয়ে খানিকক্ষণ সেই ভয়াল অন্ধকারের দিকে শরৎচন্দ্র চেয়ে রইলেন। তারপর বাঁশের ইজিচেয়ারটা বাইরে টেনে এনে তাতে পা ছড়িয়ে বসে চিন্তায় ডুবে গেলেন।

বুকের মধ্যে একটা সুর গুনগুন করতে-করতে কখন গলায় এসে গেছে শরৎচন্দ্র টেরও পেলেন না। চোখ বুজে সেই স্বতঃস্ফূর্ত গানের টানে তিনি নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন।

তারপর মেঘের ডাকের সঙ্গে পাল্লা দিতে লাগল অশান্ত সুর। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত হতে থাকল বেদনার নির্ঝরিণী।

ঝড় করাঘাত করছে জানলায়। গায়ত্রীর ঘুম ভেঙে গেল। বাতাসে কোথায় যেন কেঁপে-কেঁপে উঠছে একটা আত্মহারা সুর। গায়ত্রী না উঠে পারল না। সুরের সেই উৎস তাকে টানছে।

দরজা খুলে বাইরে এল গায়ত্রী।

বেশমণি অসাড় হয়ে ঘুমোচ্ছে।

গায়ত্রী এগিয়ে গেল। সুর এসে সমে ঠেকেছে।

একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দে শরৎচন্দ্র চমকে তাকালেন। গায়ত্রী মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে। হাওয়ায় তার আঁচল উড়ছে।

'কে! গায়ত্রী? ঘুম ভেঙে গেল?'

গায়ত্রীর চোখের কোণে জল। শাড়ির আঁচলটাকে বাগ মানাতে-মানাতে বলল, 'কী সুন্দর আপনার গলা!'

শরৎচন্দ্র তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা চাপা দেবার চেষ্টা করে বললেন, 'গায়ত্রী তোমার বিরুদ্ধে নালিশ আছে।'

'আমার নামে কে আবার আপনার কাছে নালিশ করল? নিশ্চয় বেশমণি!'

'হ্যাঁ। তুমি নাকি সারাদিন খাওনি?'

গায়ত্রী মাথা নিচু করে বলল, 'খিধে ছিল না, তাছাড়া—'

'তাছাড়া?'

'মনটাও ভালো নেই। জীবনের ওপর সত্যিই আমার ঘেন্না ধরে গেছে। ভয় হচ্ছে, আর বোধ হয় মাথা উঁচু করে বাঁচা যাবে না।'

'দেখ গায়ত্রী, অত অল্পে ভয় পেলে কি চলে? কয়েকটা ইতর মানুষকে দিয়ে গোটা মানুষ জাতকে বিচার করা ঠিক নয়। তোমাকে শক্ত হতে হবে।'

'কিন্তু ভুলগুলো যে কাঁটার মতো বিঁধছে!'

'ভুল যারা করে না, তারা আবার মানুষ কী, গায়ত্রী? কাঁটার ভয়ই যদি করতে হয়, তাহলে আমরা ফুলের নাগাল পাবো কেমন করে?'

'অত বুঝি না। শুধু জানি ঝরা ফুলে দেবতার পুজো হয় না'—বলতে-বলতে গায়ত্রী কান্নায় ভেঙে পড়ল।

শরৎচন্দ্র উঠে এসে গায়ত্রীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'ছি ছি, গায়ত্রী! তুমি কাঁদছ? এত ছেলেমানুষ তুমি?'

৭

গায়ত্রী লক্ষ্ণৌয়ে চলে গেছে। সদাশয় মেসোমশাইয়ের কাছেই সে আশ্রয় পেয়েছে।

যাবার সময়ে শরৎচন্দ্রের পায়ের ধুলো নিয়ে বলেছিল, 'জানি না আর কোনোদিন আপনাকে দেখতে পাবো কিনা। তবে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আপনাকে আমার মনে থাকবে।'

শরৎচন্দ্র তাকে আশীর্বাদ করে হেসে বলেছিলেন, 'তোমাকেই কি আমি ভুলতে পারব, ভাবছ? সংসারে সুখের সময়টিতে হঠাৎ একদিন দেখবে এক থুত্থুড়ে বুড়ো কড়া নাড়ছে—"এখন হাত জোড়া" বলে যেন তখন মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিও না!'

গায়ত্রী হাসতে পারেনি। চোখে তার জল এসে গিয়েছিল।

ছবি ছেড়ে শরৎচন্দ্রকে এখন লেখায় পেয়েছে। একটা করে অধ্যায় শেষ করেন আর যোগেন সরকারকে শুনিয়ে আসেন। 'নারীর ইতিহাস' আর 'চরিত্রহীন' দুটো লেখা একই সঙ্গে চলছে। যোগেনবাবু শুনতে-শুনতে অভিভূত হয়ে পড়েন। বলেন, 'চমৎকার হচ্ছে শরৎদা।'

কথায়-কথায় সাহিত্যের আলোচনা এসে পড়ে।

শরৎচন্দ্র বলেন, 'জানো যোগীন, বানানো গল্প লিখতে আমার মন ওঠে না। জীবনে যা দেখেছি, যা দেখে থাকি—আমি তাই সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলতে চাই। কল্পনা নিশ্চয় থাকবে। কিন্তু সে কল্পনা বলতে বোঝাবে বাস্তবের অন্তর্দৃষ্টি। সেই অন্তর্দৃষ্টির জোরেই আমরা চরিত্রগুলোকে দরকার মতো নতুন করে গড়ে-পিটে নিতে পারি।'

একটু থেমে আবার শুরু করেন, 'যোগীন, আমার কারবার মানুষের হৃদয় নিয়ে। আমি ছেলেবেলা থেকে এ পর্যন্ত ছ-সাতশো কুলত্যাগিনীর ইতিহাস সংগ্রহ করেছি। আমার এসব লেখার পেছনে আছে সেই অভিজ্ঞতা। সাবিত্রীর কথাই ধরো। সে ভদ্র, কিন্তু দরিদ্র— আর দরিদ্র বলেই সে মেসের ঝি। অথচ তারও সমাজ আছে, আত্ম-সম্ভ্রমজ্ঞান আছে। সেও প্রাণপণে সেটা রক্ষা করে চলার চেষ্টা করছে।'

'সত্যি, সাবিত্রীর মতো এমন একটা দৃঢ়স্বভাবের মেসের ঝি—'

'কোন কয়লাখনি থেকে কখন হীরেমাণিক ওঠে, তা কি কেউ বলতে পারে? এই গায়ত্রীর কথাই ধরো না, যোগীন। সুখেশান্তিতে ও সংসারে থাকতে চেয়েছিল। কী পেল সে? বাপও তার নিজের মেয়েকে ভুল বুঝল।'

'সত্যিই তাই। ওর বাবার চোখেও ও হল কুলত্যাগিনী।'

'তাহলে ভেবে দেখ, গায়ত্রীর মতো একটা শক্ত মনের মেয়ে স্বাধীন-ভাবে বাঁচবার জন্যে কোথাও যদি দাসীবৃত্তি করে আর চারপাশের প্রলোভন থেকে যদি সে নিজেকে সরিয়ে রাখে, সেটা কি খুব অবাস্তব বা অসামাজিক হবে?'

'আসলে আমাদের দেশের সমাজটাই এমন যে, কোনো কিছু তলিয়ে দেখতে চায় না।'

'আমরা সমাজ-সমাজ করে মরি, তার আসল চেহারাটা জানতে আমার বাকি নেই। মানুষ না খেয়ে মরুক, দেখেও দেখবে না—এমন ভান করবে যেন অন্ধ। কিন্তু মেয়েপুরুষের ভালোবাসার বেলায় একেবারে উল্টো। লাঠি উঁচিয়ে হাঁ-হাঁ করে তেড়ে আসবে। জানো যোগীন, মানুষ ভয় পেয়ে-পেয়ে মিথ্যে ভয়টাকেই বিধিবদ্ধ আইন করে তোলে। পুরুষমানুষ যদিও বা সে আইনকে ফাঁকি দিতে পারে, মেয়েদের হাত-পা একেবারে বাঁধা। একটু পান থেকে চুন খসলেই তাদের পড়ে-পড়ে মার খেতে হয়।'

যোগেনবাবু অভিভূতের মতো শুনছিলেন। নারীজীবনের এই ব্যথার দিকটা এমন করে আগে কখনো কেউ তাঁর নজরে আনেনি। এ যেন এক বিস্ময়কর নতুন অভিজ্ঞতা যা মানুষকে শুধু দেখতে শেখায় না, বদলাতেও সাহায্য করে।

'আমি এখন উঠি, যোগীন'—শরৎচন্দ্রের কথায় যোগেনবাবুর সম্বিৎ ফিরে এল।

বাইরে তাকিয়ে দেখলেন বেশ রাত হয়েছে। বললেন, 'দাঁড়াও শরৎদা, তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।'

শরৎচন্দ্র উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'না যোগীন, আমি একাই ফিরতে পারব। তাছাড়া জানোই তো, আমাদের গলিটা ভালো নয়। রাত-বিরেতে ও-রাস্তায় অচেনা লোকের হাঁটা মুশকিল। নিশাচরী, মাতাল, চোর, পুলিশে নরক গুলজার করে রেখেছে।'

৮

রাত হয়েছে বেশ।

চক্রবর্তীর বাড়ির সামনে একদল মত্তকণ্ঠে হৈ-হল্লা করছিল। এ প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ধেনোমদ আর জুয়োখেলায় নৈশ মজলিশ জমে ওঠে।

এক লোহালক্কড়ের কারখানায় মিস্ত্রির কাজ করে চক্রবর্তী। তার মজলিশে যারা আসে, তারা প্রায় সবাই তার সহকর্মী।

চক্রবর্তীর বউ অনেকদিন আগে মারা গেছে। সংসারে থাকার মধ্যে শুধু এক মেয়ে, শান্তি। তার বিয়ের বয়স হয়েছে। অথচ মেয়ের বিয়ে দেবার কথা চক্রবর্তী আদৌ ভাবে বলে মনে হয় না।

এদিকে শান্তির জীবন দিন-দিন দুঃসহ হয়ে উঠছে। বাবা তার এমনিতে লোক খারাপ নয়। কিন্তু পেটে মদ পড়লে একেবারে জানোয়ারের অধম হয়ে যায়। শান্তি তাকে মদ ছাড়াতে কত চেষ্টা করেছে, কোনো ফল হয়নি।

শান্তি সারাদিন থাকে বেশ। কিন্তু সন্ধ্যে হলে ভয়ে তার হাত-পা হিম হয়ে আসে। মদ পেটে পড়লে চক্রবর্তীর বন্ধুদেরও মাথার ঠিক থাকে না। শান্তির দিকে তারা এমনভাবে তাকাতে থাকে যে, শান্তি পালাতে পথ পায় না।

আজকের আড্ডায় বুড়ো ঘোষাল এসে পর্যন্ত এমন একটা ভাব নিয়ে কথাবার্তা বলছিল যেন সে চক্রবর্তীর মাথা কিনে রেখেছে। গোড়া থেকেই তার হাবভাব শান্তির ভালো লাগেনি।

ব্যাপারটা চরমে উঠল যখন ঘোষাল হঠাৎ ঘরে ঢুকে খপ করে শান্তির হাত চেপে ধরল। একটা ঝটকা মেরে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে শান্তি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগল। সেই সঙ্গে তাকে ধরবার জন্যে টলতে-টলতে বুড়ো ঘোষালও তার পেছন-পেছন গেল।

সামনে একটা সিঁড়ি। শান্তি পেছনে এক মুহূর্ত তাকাল। বুড়ো বিড়-বিড় করে বকতে-বকতে তখনো তার পেছন-পেছন আসছে।

শান্তি হন-হন করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। তাকে ধরতে না পেরে বুড়ো সিঁড়ির সামনে বসে পড়ে মদের ঝোঁকে ভেউ-ভেউ করে কেঁদে উঠল।

বুড়োর কান্না শুনে মানিকলাল আর শেতলচাঁদ টলতে-টলতে গিয়ে বুড়োকে ধরে আনল। বুড়োকে ভেউ-ভেউ করে কাঁদতে দেখে আড্ডার আরও দুচারজন তার সঙ্গে সুর করে কাঁদতে বসল।

চক্রবর্তী বুড়োর মুখ থেকে তার দুঃখের কারণটা শুনল। তারপর সে রেগেমেগে জড়ানো গলায় বলতে লাগল, 'নাঃ, হারামজাদীকে নিয়ে আমি জেরবার হয়ে গেলুম এই বুড়ো বয়েসে। তুমি কেঁদো না, ঘোষাল—ও আসুক, ওকে আমি চুলের মুঠো ধরে—'

চক্রবর্তীর শেষ কথাটা কানে যেতেই শরৎচন্দ্র দাঁড়িয়ে পড়লেন। গলা বাড়িয়ে জিগগেস করলেন, 'এত রাত্তিরে কার চুলের মুঠি ধরতে চাও, চক্রবর্তী ?'

'কার আবার ? পোড়ারমুখী লক্ষ্মীছাড়ীটার।'

'শান্তির ? সে আবার কী করল ?'

'আর বলো কেন, বাপু! ঘোষালকে কত বলে-কয়ে রাজী করালুম মেয়েটাকে নিতে, তা মেয়ে আমার ঝটকা মেরে ছুটে পালাল। ঘোষালের ঘরে মেয়ের আমার কোনোদিন ভাতকাপড়ের দুখ্যু হত না। তাছাড়া আমার দেনাটাও মাপ হয়ে যেত।'

'বটে ? সেইজন্যে বুড়োর গলায়—'

'ঘোষাল আবার বুড়ো কোথায়? আমার চেয়ে তো মোটে বছর পাঁচেকের বড়। তাছাড়া ঘোষাল আর কদিন। দুদিন পর সবই তো আমার ঐ মেয়েরই হবে।'

শরৎচন্দ্র বোঝেন চক্রবর্তী এখন প্রকৃতিস্থ নয়। ওর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। রাত কেটে গেলে ওর আর এ-মূর্তি থাকবে না।

তাই হেসে বললেন, 'তুমি এত পাকা হিসেবী, তাতো জানতাম না, চক্রবর্তী? আচ্ছা, কাল এ-বিষয়ে কথা হবে।'

শরৎচন্দ্র নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। মনের মধ্যে খচ-খচ করতে লাগল। নেশার ঝোঁকে মানুষ সব করতে পারে। অথচ শান্তির মতো মেয়ের জীবনে এমন একটা সর্বনাশ ঘটে যাবে ভাবাও যায় না। দেনার দায়ে ঘোষালের কাছে চক্রবর্তী মাথা বিকিয়ে রেখেছে—একথা সবাই জানে। সেইজন্যেই ব্যাপারটায় শরৎচন্দ্র চিন্তিত না হয়ে পারলেন না।

অন্যমনস্ক হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরে ঢুকতে গিয়ে শরৎচন্দ্র অবাক হলেন। না, তালা দেওয়া নেই। দরজাটা তবু খুলছে না কেন? দরজাটা যে ভেতর থেকে বন্ধ, এটা বুঝতে তাঁর খানিকটা সময় লাগল।

ধাক্কা দেবার আগেই দরজাটা ভেতর থেকে খুলে দিয়ে মুখ নিচু করে একপাশে যে সরে দাঁড়াল, একেবারে সে অপ্রত্যাশিত না হলেও শরৎচন্দ্র তার জন্যে মনে-মনে ঠিক প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ঘোষালের ঋণ-পরিশোধের কথা ভাবছিলেন। এমন সুন্দর একটা জীবন কিছুতেই নষ্ট হতে দেওয়া যায় না।

শরৎচন্দ্র অবাক হয়ে বললেন, 'শান্তি, তুমি এখানে?' তারপর ঘরের আলোটা জ্বালালেন।

শান্তির চোখে জল। চোখ মুছতে-মুছতে বলল, 'বিপদে পড়ে আমার তখন মাথার ঠিক ছিল না। তাই ছুটে এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছিলাম।'

'বেশ করেছিলে। তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসো।'

'না। এখন আমি যাই।' শান্তি দরজার দিকে এগোল।

'মদের আড্ডা এখনো ভাঙেনি। আমি এখুনি দেখে আসছি।'

যেতে-যেতে শান্তি কী মনে করে দাঁড়িয়ে পড়ল। সত্যিই তার ভয় করছে।

ইজিচেয়ারে বসে পড়ে শরৎচন্দ্র বললেন, 'শান্তি, তুমি যেও না। কথা আছে।'

দরজায় ঠেস দিয়ে শান্তি দাঁড়িয়ে রইল।

শরৎচন্দ্র বললেন, 'ঘোষালের যা পাওনা, কালকেই আমি মিটিয়ে দেব।'

শান্তি এবার চোখে চোখ রেখে তাকাল। চোখে তার অশ্রুর বদলে জ্বালা।

'আপনার অসীম দয়া। কিন্তু তার দরকার নেই।'

শরৎচন্দ্র অবাক হয়ে তাকালেন। বললেন, 'তুমি কী বলতে চাইছ, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, শান্তি।'

'মাথা দিয়ে সব জিনিস বোঝা যায় না। মন থাকা চাই।' শান্তির চোখ আবার জলে ভরে উঠেছে। আর স্বল্প আলোয় তাকে আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে।

শরৎচন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন। একেবারে অন্য চেহারা। অত বড় কঠিন মানুষটা একেবারে যেন শিশুর মতো অসহায়। চোখের কোণে টলটল করছে জল।

শান্তির কাঁধে হাত রেখে তিনি বললেন, 'তুমি চোখে বড্ড কম দেখ, শান্তি। এমনি কপাল আমার যে, শেষকালে অন্ধ নিয়ে ঘর করতে হবে?'

শান্তি খানিকক্ষণ অভিভূতের মতো তাকিয়ে রইল। তারপর উচ্ছ্বসিত আবেগে শরৎচন্দ্রের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

৭

শাঁখ বাজাচ্ছিলেন শান্তিদেবী। কপালে টিপ। সিঁথিতে সিঁদুর। পরনে পট্টবাস। সামনে দেবতার চিত্রপট, ফুলফল, বিল্বপত্র, কোশাকুশী।

শরৎচন্দ্রের ঘরের চেহারা এই দু-বছরে বদলে গেছে। সেই ছন্নছাড়া দশা আর নেই।

আসবাবপত্র যে খুব বেড়েছে, তা নয়। পুরনো জিনিসগুলোই বেশ একটু সাজানো-গোছানো। এক কথায় বলা যায়, ঘরে লক্ষ্মীর হাত পড়েছে।

সংসারে আমদানির মধ্যে 'বাটুবাবা' আর 'ভেলি'। বাটুবাবা হল কাকাতুয়া। দাঁড়ের ওপর বসে সে সারাক্ষণ বকবক করে। আর শরৎচন্দ্রের পায়ের কাছে বসে ল্যাজ নাড়ায় ভেলি কুকুর।

শরৎচন্দ্রের সামনে বই খাতাপত্র আর দোয়াত কলম। বাঁ হাতে ধরা রয়েছে গড়গড়ার নল।

শান্তিদেবী পুজো শেষ করে শরৎচন্দ্রের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'সারাক্ষণ শুধু লেখা আর লেখা। পারোও তুমি, যাহোক। কই, হাঁ করো তো।'

প্রসাদ মুখে নিয়ে শরৎচন্দ্র জিগগেস করলেন, 'আজ আবার কিসের পুজো?'

'বা রে, পাড়ায় প্লেগ লেগেছে না!'

'ও হরি, রুগীর সেবা করেও বুঝি আশ মিটছে না, আবার ঠাকুর-দেবতার সেবাও করতে হবে?'

'যাও, তুমি ওসব বুঝবে না। তুমি তোমার লেখাপড়া নিয়েই থাকো।'

খানিক পরে এক কাপ গরম চা এনে শরৎচন্দ্রের হাতে দিয়ে শান্তি-

দেবী জিগগেস করলেন, 'তোমার পায়ের ব্যথাটা এখন কেমন?'

চায়ের সঙ্গে একটা আফিঙের ডেলা মুখে পুরে দিয়ে শরৎচন্দ্র বললেন, 'পেটে আফিং পড়লে ব্যথা-ট্যাথা সব পিঠটান দেয়। তাছাড়া এখন আমার পায়াও খুব ভারি। "বড়দিদি" বেরোবার পর কলকাতায় খুব নাকি হৈ-হৈ হয়েছে। সুরেন, সৌরীন, উপীন, বিভূতি—এদের এখন মতলব আমাকে বাইরে বার করার। জানে না তো, এদিকে আমি "চরিত্রহীন" নিয়ে কী নাকানি-চোবানি খাচ্ছি। কবে যে এটা শেষ হবে—'

শান্তিদেবী মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন। খানিক পরে বললেন, 'বুঝেছি, আর এক কাপ চা চাই এই তো? বললেই হয়।'

শরৎচন্দ্র হাসলেন। তারপর বললেন, 'আচ্ছা বড়-বৌ, একটা কথা তোমাকে জিগগেস করা হয় না। এই টাকায় তুমি কী করে চালাও, বলো তো? আমার তো কিছুতেই মাথায় ঢোকে না।'

'সব ব্যাপারেই কি সকলের মাথা খেলে? আমি কি মাথা খুঁড়লেও গল্প লিখতে পারব?'

'তা বটে। তাহলে আরেক কাপ চা পাচ্ছি।'

শরৎচন্দ্র আবার লেখায় মন দিলেন। ভেলির বোধ হয় সেটা পছন্দ হল না। কর্তার দিকে তাকিয়ে দু-একবার ল্যাজ নাড়ল। তারপর আড়ামোড়া ভেঙে উঠে পড়ে শান্তিদেবীর পেছনে-পেছনে ভেতর-মহলে চলে গেল।

কিন্তু শরৎচন্দ্র যে সোয়াস্তি হয়ে একটু লিখবেন সে উপায় নেই। হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে হাজির হল মানিকলাল আর শেত্‌লা।

মানিকলাল বলল, 'দা-ঠাকুর, এক্ষুণি তোমাকে একবার যেতে হবে, বাপু। বৌটা কাটা ছাগলের মতো ছটফট করতেছে।'

'সে কি রে, এই তো সকালে ওষুধ দিয়ে এলাম। আচ্ছা, যা তোরা—আমি এখুনি যাচ্ছি।'

প্লেগের দাপট দিন-দিনই বাড়ছে। ওষুধপত্র, পুজো-মানত কিছুতেই বাগ মানছে না।

ভাঙা কাঠ, দরমা আর পুরনো টিন দিয়ে ছাওয়া স্যাঁতসেঁতে খুপরি-খুপরি আলোবাতাসহীন ঘরগুলো থেকে রোজই আর্তরোল উঠছে। মিস্ত্রিপাড়াটা প্রায় সাফ হয়ে যেতে বসেছে। চারদিকে থমথম করছে মৃত্যুভয়।

শরৎচন্দ্র আর শান্তিদেবী দিনরাত চরকির মতো ঘুরছেন।

রাস্তার মধ্যে ছোট-ছোট জটলা। আর উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন :

'চললে ঠাকরুণ দিদি ? কেমন দেখলে, বাঁচবে ?'

'একটু ভালো বলেই তো মনে হল।'

'যা করতেছ তুমি আমাদের জন্যে। এখন তোমার শরীরটা ভালো থাকলে হয়।'

'এই যে দা-ঠাকুর, তোমার লেগে বসে আছি হাপিত্যেশ হয়ে।'

রাস্তা ধরে এগোতে-এগোতে শরৎচন্দ্র জিগগেস করেন :

'কেনার মা এখন কেমন রে ? ফুলোটা একটু কমেচে ?'

'কে জানে বাপু, বুঝতে পারিনে কিছু।'

'মানিক, তোমার বৌ এখন কেমন ?'

'বেম্মোশক্তি' বলবান। ইকি যা তা বাক্যি, দাদাঠাকুর! তোমার শিচরণের ধুলো খেয়ে—বলতে নেই—এখন একটু নিথর হয়ে আছে।'

'আচ্ছা, আমি গিয়ে আরেকবার দেখে আসব'খন। চলো দাশু, তোমার ছেলেকে দেখে আসি।'

যে ভয় করা যাচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত তাই হল। শান্তিদেবীও রোগে পড়লেন।

শরৎচন্দ্র মিস্ত্রীপাড়ায় রোগী দেখতে গিয়ে বাড়ির ঝির মুখে স্ত্রীর হঠাৎ অসুখের খবর পেয়ে সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে গিয়েছিলেন রেঙ্গুনের নামকরা ডাক্তারের কাছে।

ডাক্তারও সাধ্যমতো সমস্তই করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

স্বামীর কোলে মাথা রেখে শান্তিদেবী চিরদিনের মতো চোখ বুজলেন।

শরৎচন্দ্রের চোখে জল নেই। নির্বাক শূন্য দৃষ্টি। বন্ধুরা শঙ্কিত হলেন। বেদনার অকূল পাথারে কান্নাও যেন থই খুঁজে পাচ্ছে না।

দিন কয়েক পরে পাড়ায় আগুন লাগল। ঘেঁষাঘেঁষি কাঠের বাড়ি। কাজেই আগুনের কবল থেকে পাড়ার একটি বাড়িও নিস্তার পেল না।

শরৎচন্দ্র নিজের জ্বলন্ত ঘরটার মধ্যে ছুটে গেলেন। ভেলি আর বাটুবাবা চারদিকে আগুনের হল্কার মধ্যে ভয়ে চিৎকার করছে। এক হাতে কুকুর আর পাখিটাকে নিয়ে, অন্য হাতে ছবি আঁকার কয়েকটা সরঞ্জাম জাপটে ধরে কোনোরকমে টলতে-টলতে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন।

একটু পরেই বাড়িটা ধোঁয়া আর আগুনের শিখার মধ্যে ধ্বসে পড়ল। শরৎচন্দ্রের বহু সাধের ছবিগুলো, 'চরিত্রহীন' আর 'নারীর ইতিহাসে'র পাণ্ডুলিপি, দামী-দামী বই, আসবাব সমস্তই আগুনের গর্ভে মিলিয়ে গেল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলতে-ফেলতে শরৎচন্দ্র বললেন, 'তাহলে এবার সব দিক দিয়েই সবরকমে আগুন লাগল।'

১০

১৯১২ খৃষ্টাব্দ।

শরীর ভালো যাচ্ছিল না বলে শরৎচন্দ্র আপিস থেকে ছুটি নিয়ে কিছুদিনের জন্যে কলকাতায় এলেন। হাওড়ার খুরুট রোডে একটা দোতলা বাড়ি। সেখানেই সাময়িকভাবে আস্তানা গাড়লেন।

মেঝের ওপর বিছানা পাতা। বইপত্রগুলো ছড়ানো। একপাশে নানা রঙের কালি আর আট-দশটা ফাউন্টেন পেন। সব সময় একই কালিতে একই কলমে লিখতে তাঁর মন চায় না। তাই হাতের কাছে রকমারি কালি আর রকমারি নিবের কলমের ব্যবস্থা।

শরৎচন্দ্র লিখছিলেন। ডাক শুনে মুখ তুলে দেখেন উপেন্দ্রনাথ এসে হাজির।

'আরে উপীন যে, তুমি এখানে কেমন করে!'

ঘরে ঢুকে বসতে-বসতে উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'কেমন করে আবার? পায়ে হেঁটে। বেলুড় মঠে গিয়ে প্রভাসের কাছ থেকে তোমার ঠিকানাটা নিয়ে অতি কষ্টে এসে খুঁজে বের করেছি তোমাকে।'

শরৎচন্দ্রের মেজো ভাই প্রভাস। তখনো তিনি প্রভাস ব্রহ্মচারী। স্বামী বেদানন্দ তখনো হননি।

কলমটি রেখে দিয়ে শরৎচন্দ্র বললেন, 'বটে!'

'হ্যাঁ। কিন্তু তোমার একি কাণ্ড বলো দেখি?'

'কিসের?'

'এই যে হঠাৎ একেকদিন হুট্ করে আমাদের বাড়িতে গিয়ে চিঠি লিখে আসো: উপীন, দেখা করতে এসেছিলাম তোমার সঙ্গে, দেখা হল না—আর একদিন আসবো। কী ব্যাপার?'

উপেন্দ্রনাথরা তখন ভবানীপুর কাঁসারীপাড়া রোডের এক বাসা-বাড়িতে থাকতেন।

শরৎচন্দ্র লেখার কাগজগুলো গোছাতে-গোছাতে জবাব দিলেন, 'ঠিকই তো। যাই যে এটাও সত্যি, দেখা যে হয় না এটাও সত্যি। দেখা হবে না জানতে পারলে কেউ কি আর কষ্ট করে পয়সা খরচ করে শুধু-শুধু অতদূর যেতে চাইতো? অথচ এসে পর্যন্ত একদিনও তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না।'

উপেন্দ্রনাথ হেসে বললেন, 'সবই তো বুঝলাম। কিন্তু চিঠিতে নিজের ঠিকানা দেবার কথাটা কেন খেয়াল থাকে না, অন্তত আবার কবে কখন আসছ—সেটুকু লিখলেও তো পারতে। যাক সে কথা, কী লিখছিলে?'

'চরিত্রহীন।'

'চরিত্রহীন? সেটা কি পদার্থ।'

'উপন্যাস। এইবার নিয়ে দুবার লিখছি। আগের বারেরটা বাড়িতে আগুন লেগে পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। চার-পাঁচশো পাতা লিখে-ছিলাম।'

'লেখাটা দাও তো, একটু দেখি।'

মোটে পাঁচ-ছটা পরিচ্ছেদ লেখা হয়েছে। কাগজগুলো উপেন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিয়ে শরৎচন্দ্র বললেন, 'তুমি ততক্ষণ দেখ, আমি একটু চায়ের যোগাড় দেখি।'

কিছুক্ষণ পরে চায়ের কাপ হাতে ফিরে এসে শরৎচন্দ্র দেখলেন উপেন্দ্রনাথ তন্ময় হয়ে পড়ছেন।

সামনে চায়ের কাপ রেখে জিগগেস করলেন, 'কী রকম লাগছে?'

'এখন বিরক্ত কোরো না।'

'তুমি কি এখনই বসে সব পড়ে ফেলতে চাও নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু উপীন, সে অনেক সময় লাগবে। তার চেয়ে এক কাজ কর—'

উপেন্দ্রনাথ সোৎসাহে শরৎচন্দ্রের দিকে তাকালেন।

শরৎচন্দ্র বললেন, 'কাগজগুলো বাড়ি নিয়ে যাও। কাল বিকেলে তোমাদের বাড়ি থেকে আমি নিয়ে আসব'খন।'

'সেই ভালো। তবে তুমিই বা কেন আর কষ্ট করে যাবে! বরং পরশুদিন আমিই নিয়ে আসব।'

'বেশ। আমি পরশু তোমার জন্যে বাড়িতে অপেক্ষা করব। কেমন লাগল বলবে।'

চায়ের পর্ব শেষ করে শরৎচন্দ্র উপেন্দ্রনাথকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলেন।

পাণ্ডুলিপি পড়ে উপেন্দ্রনাথ তো মুগ্ধ। কাগজগুলো বগলে করে তিনি ছুটলেন 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশ সমাজপতির কাছে। লেখাটা শুনে সমাজপতি মশাই রচনাগুণের খুব তারিফ করলেও লেখার বিষয়বস্তুটা তাঁর একেবারেই পছন্দ হল না।

অগত্যা উপেন্দ্রনাথ ফিরে এসে 'যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালের কাছে কথাটা পাড়লেন। ফণীবাবু উপেন্দ্রনাথের বন্ধু। উপেন্দ্রনাথের বাড়ির কাছেই 'যমুনা' পত্রিকার অফিস।

ফণীবাবু তো হাত বাড়িয়েই ছিলেন। উপেন্দ্রনাথকে তিনি ধরে বসলেন 'যমুনা'য় নিয়মিতভাবে যাতে শরৎচন্দ্রের লেখা পাওয়া যায়।

শরৎচন্দ্রকে ধরবার জন্যে উপেন্দ্রনাথ এক জাল ফেলার ব্যবস্থা করলেন।

গল্প করতে-করতে উপেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে বুঝতে না দিয়ে একদিন হুট্ করে কাঁসারীপাড়া রোডে 'যমুনা' পত্রিকার আপিসে ঢুকে পড়লেন।

শরৎচন্দ্র গাঁই-গুঁই করে বললেন, 'এ তুমি কোথায় নিয়ে এলে, উপীন ? এ যে দেখছি "যমুনা" পত্রিকার আপিস ? কী ব্যাপার ? এত সাজানো-গোজানো কেন ?'

উপেন্দ্রনাথ এবার হাসতে-হাসতে বললেন, 'তোমাকে নিয়ে আসব বলে রেখেছিলাম।'

ফণীবাবু এগিয়ে এসে শরৎচন্দ্রের পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করতে গেলেন।

শরৎচন্দ্র তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরে ফেলে বললেন, 'হয়েছে, হয়েছে—আবার পায়ে হাত দেওয়া কেন !'

উপেন্দ্রনাথ পাশে দাঁড়িয়ে আলাপ করিয়ে দিলেন।

'ইনি ফণীন্দ্রনাথ পাল। "যমুনা"-র সম্পাদক। আর ইনি—'

ফণীবাবু বলে উঠলেন, 'থাক, আর বলতে হবে না। "ভারতী" পত্রিকায় "বড়দিদি" পড়বার পর থেকে আমি ওঁর একনিষ্ঠ ভক্ত।'

ভেতরে ইজিচেয়ার পাতা। শরৎচন্দ্র তাতে বসলেন। ফণীবাবুর চাকর সঙ্গে-সঙ্গে কল্‌কেয় ফুঁ দিতে-দিতে গড়গড়া এনে হাজির করল। অম্বুরী তামাকের সুমিষ্ট গন্ধে সারা ঘর ভরে গেল।

শরৎচন্দ্র সাগ্রহে গড়গড়ার নলটা তুলে নিলেন। আর তারপরই তাঁকে দেখে মনে হল এবার তিনি বেশ জমিয়ে বসবেন।

ফণীবাবুর দিকে তাকিয়ে ইশারা করে উপেন্দ্রনাথ মৃদু হাসলেন।

এবার ফণীবাবুও সাহস পেয়ে কথাটা পাড়লেন :

'দাদা, অনেক কষ্ট করে একটা কাগজ বার করেছি—দেখেছেন বোধহয়।'

শরৎচন্দ্রের মেজাজ খুব ভালো। বললেন, 'তা আর দেখিনি ! উপীন কি আর দেখাতে বাকি রেখেছে ?'

ফণীবাবু বললেন, 'কাগজটাকে যদি আপনাদের আশীর্বাদে বাঁচিয়ে রাখতে পারি—'

গড়গড়ার নলে লম্বা টান দিয়ে শরৎচন্দ্র বললেন, 'আন্তরিক চেষ্টা থাকলে তোমার কাগজ নিশ্চয় দাঁড়াবে, ফণী। বিশেষত উপীন যখন তোমার সহায়। কী বলো, উপীন?'

উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'আছি বটে। তবে "স"-বিনে শুধু "হায়" হয়ে। তুমি যদি একটু কৃপা কর, তবেই "যমুনা"র সহায় হয়।'

শরৎচন্দ্র হেসে ফেললেন, 'ভণিতা রাখো, উপীন। আসলে আমাকে "যমুনা"য় লেখাতে চাও, এই তো? এই জন্যেই ভুলিয়ে এখানে আনা।'

ফণীবাবু হাত জোড় করে বললেন, 'না দাদা, শুধু লেখা দেওয়া নয়। "যমুনা"কে নিজের কাগজ বলে মনে করতে হবে। কাগজ কী হলে ভালো হবে না হবে সে রাস্তাও আপনাকেই দেখিয়ে দিতে হবে।'

শরৎচন্দ্র একটু ভাবলেন, 'আচ্ছা, আমি ভেবে দেখি। দু-এক-দিনের মধ্যেই আমাকে বর্মায় ফিরে যেতে হচ্ছে। সেখান থেকে জানাব।'

'কাগজের পুরো সেট আমি এখুনি আপনার সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি।'

শরৎচন্দ্র গড়গড়ার নলটা সরিয়ে রেখে উঠতে যাচ্ছিলেন।

ফণীবাবু বললেন, 'একটিবার ভেতরে যেতে হবে।'

'কেন হে?'

'আপনার জন্যে মা নিজের হাতে কিসব করেছেন—'

শরৎচন্দ্র উপেন্দ্রনাথের দিকে তাকালেন। বললেন, 'দেখ দিকি কাণ্ড, আবার এসব কেন? না, না…'

উপেন্দ্রনাথ হেসে বললেন, 'আমাদের কথা ঠেলতে পারো, কিন্তু মা—'

'তাও তো বটে। তাহলে চলো, উপীন—"যমুনা"য় এরা দেখছি না লিখিয়ে ছাড়বে না।'

১১

রবীন্দ্রনাথ যে বছর নোবেল প্রাইজ পেলেন, ঠিক সেই সময় শরৎচন্দ্রেরও বাংলা সাহিত্যে স্বনামে প্রথম আবির্ভাব। তাঁর বয়স তখন ছত্রিশের কাছাকাছি।

শরৎচন্দ্রের পরিণত বয়সের প্রথম রচনা 'রামের সুমতি' প্রকাশিত হল 'যমুনা' পত্রিকায়। পত্রিকাটি তখনো ছোট ; তাতে প্রতিষ্ঠাবান কোনো সাহিত্যিকই সে যুগে লিখতে রাজী হতেন না। পাঠকসমাজ তখনো শরৎচন্দ্রের নাম জানতেন না। কাজেই এরকম একটি কাগজে পরিণত বয়সে স্বনামে প্রথম লেখা ছাপানো এবং সেই লেখা দিয়ে পাঠক সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করা—যথেষ্ট শক্তি ও আত্মবিশ্বাস না থাকলে সম্ভব হত না।

বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকেরা ছুটে এলেন লেখার জন্যে। কিন্তু শরৎচন্দ্র তার আগেই বর্মায় সরে পড়েছেন। চিঠির পর চিঠি, টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম যেতে লাগল—অন্তত একটি করেও লেখা চাই। শুধু সম্পাদকেরা নন, বন্ধুবর্গ এবং সেই সঙ্গে অসংখ্য মুগ্ধ পাঠক-পাঠিকা।

শরৎচন্দ্রকে হাতের কাছে না পেয়ে সমস্ত চাপ এসে পড়তে লাগল সুরেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথের ওপর। শরৎচন্দ্রের কৈশোরের সব রচনা তাঁদের কাছেই গচ্ছিত ছিল। ফলে, তাগাদায় অস্থির হয়ে তাঁরা শরৎচন্দ্রের এক রকম বিনা অনুমতিতেই তার থেকে কিছু-কিছু 'যমুনা' ও 'সাহিত্যে' প্রকাশ করে দিলেন।

অবশ্য এতদিকের এত অনুরোধ শরৎচন্দ্রও ঠেলতে পারলেন না। তাঁকে বাধ্য হয়ে কলম ধরতে হল। স্বনামে ও বেনামে পত্রিকায়-

পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের লেখা গল্প ও প্রবন্ধের স্রোত বইতে লাগল। মাত্র দেড় বছরেরও ঢের কম সময়ের মধ্যে তাঁর এই লেখাগুলি প্রকাশিত হল :

ফণীন্দ্রনাথ পাল সম্পাদিত 'যমুনা'য় (১৩১৯-২০)

১। বোঝা (ধারাবাহিক গল্প, কৈশোরের রচনা)
২। রামের সুমতি (ধারাবাহিক গল্প)
৩। নারীর লেখা (প্রবন্ধ, অনিলা দেবীর ছদ্মনামে)
৪। পথনির্দেশ (বড় গল্প)
৫। চন্দ্রনাথ (ধারাবাহিক গল্প, কৈশোরের রচনা)
৬। আলোছায়া (গল্প, কৈশোরের রচনা)
৭। ছায়া (গল্প, কৈশোরের রচনা)
৮। বিচার (গল্প, কৈশোরের রচনা)
৯। বিন্দুর ছেলে (বড় গল্প)
১০। চরিত্রহীন (উপন্যাস, কয়েকটি পরিচ্ছেদ)
১১। ক্ষুদ্রের গৌরব (কৈশোরের রচনা)
১২। নারীর মূল্য (প্রবন্ধ, অনিলা দেবীর ছদ্মনামে)
১৩। কানকাটা (সমালোচনা, অনিলা দেবীর ছদ্মনামে)

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় (১৩১৯)

১৪। বাল্যস্মৃতি (কৈশোরের রচনা)
১৫। কাশীনাথ (ধারাবাহিক গল্প, কৈশোরের রচনা)

কলকাতায় তখন 'ভারতবর্ষ' বার করার তোড়জোড় চলছিল। মেসার্স্ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স-এর গুরুদাসবাবুর বড় ছেলে

হরিদাসবাবুর কলেজের বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য শরৎচন্দ্রেরও ছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। ঐ পুস্তক-প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে 'ভারতবর্ষ' প্রকাশ করানোর ব্যাপারে প্রমথনাথের চেষ্টাই সবচেয়ে বেশি ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই পত্রিকার সম্পাদক হতে রাজী হলেন।

শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে লেখা আদায়ের জন্যে হরিদাসবাবু প্রমথনাথকে ধরলেন।

শরৎচন্দ্র তখন 'চরিত্রহীন' লিখতে ব্যস্ত। তিনদিক থেকে তিনটি কাগজ তাঁর উপন্যাসটি নিয়ে টানাটানি শুরু করে দিল।

ফণীবাবু তো চিঠির পর চিঠি লিখে চলেছেন। খবর পেয়ে 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশ সমাজপতি পূর্ব মত পাল্টে শরৎচন্দ্রকে ধরে বসলেন। বন্ধুত্বের দাবি নিয়ে ওদিকে প্রমথবাবুও হলেন 'চরিত্রহীনে'র প্রার্থী।

শরৎচন্দ্রের প্রকাশিত গল্পগুলি পাঠকদের শুধু প্রশংসাই কুড়োয়নি, সেই সঙ্গে কোনো-কোনো মহল থেকে তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি প্রচারের অভিযোগও উঠেছিল।

তাই শরৎচন্দ্র কিছুটা ঠেস দিয়ে প্রমথনাথকে এক চিঠিতে লিখলেন :

'চরিত্রহীন তোমাকে পড়তে দিতে পারি কিন্তু মুদ্রিত করবার জন্য নয়। ...তোমাদের সুরুচির দলের মধ্যে গিয়ে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়বে... আমার রিসেন্ট লেখা প্রভৃতি আলোচনার পরে যদি ভালো ওপিনিয়ান হয় এবং আমার লেখা চাও নিশ্চয়ই দেবো—কিন্তু, এখন নয়।'

আরেকটি চিঠিতে লিখলেন :

'একটা অহঙ্কার করব—মাপ করবে ?...আমার চেয়ে ভালো নভেল কিম্বা গল্প এক রবিবাবু ছাড়া আর কেউ লিখতে পারবে না। যখন এই কথাটা মনে জ্ঞানে সত্য বলে মনে হবে—সেইদিন প্রবন্ধ বা গল্প বা উপন্যাসের জন্য অনুরোধ কোরো।'

অন্য একটি পত্রে লিখলেন :

'তোমরা টাকা দেবে, তোমাদের ইনফ্লুয়েন্স্ ছোট সাহিত্যসেবীদের

মধ্যে প্রচুর—কিন্তু আমি ছোট সাহিত্যসেবীও নই এবং টাকার কাঙালও নয়। অন্তত আত্মসম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে নয়। একা তুমি এবং তোমার ভালোবাসা ছাড়া আমাকে কিনতে পারে, এত টাকা তোমাদের কলকাতাতেও নেই।…প্রমথ, বেশি গর্ব করা ভালো নয়, আমি কি তা আমি জানি। আমি যে কোনো কাগজকে আশ্রয় দিয়েই তাকে বড় করতে পারি—এ যদি তোমার মিথ্যা কথা বলে মনে হয়, বেশি দিন নয়—একটা বৎসর দেখো—তার পরে বলবে শরৎ কেবল জাঁকই করে না।..'

ইতিমধ্যে প্রমথবাবুর ক্রমাগত তাগিদে শরৎচন্দ্র তাঁকে ব্যক্তিগত-ভাবে পড়বার জন্যে 'চরিত্রহীনে'র কিছুটা অংশ পাঠিয়েছিলেন। ওদিকে 'যমুনা'য় ধারাবাহিকভাবে 'চরিত্রহীন' প্রকাশিত হবে বলে বিজ্ঞাপন বেরিয়ে গেল। কিছুদিন পরে প্রমথবাবুদের মতামত জানতে পেরে শরৎচন্দ্র লিখলেন :

'…আমি জানিতাম ওটা তোমাদের পছন্দ হইবে না এবং সে কথা পূর্ব পত্রে লিখিয়াওছিলাম। তবে, এ সম্বন্ধে আমার এই একটু বলিবার আছে যে, যে লোক জানিয়া শুনিয়া "মেসের ঝি"কে আরম্ভতেই টানিয়া আনিবার সাহস করে, সে জানিয়া শুনিয়াই করে। তোমরা… সাবিত্রীকে মেসের ঝি বলিয়াই দেখিয়াছ প্রমথ, হীরাকে কাঁচ বলিয়া ভুল করিলে ভাই…কাউণ্ট টলষ্টয়ের "রিসরেকশন" পড়েছ কি ? হিজ বেস্ট্ বুক একটা সাধারণ বেশ্যাকে লইয়া।…লিখিয়াছ বিধবা ভিন্ন ছোট গল্প জমে না (ঠাট্টা করিয়া ?) হয়তো তোমার কথাই সত্য, অত বড় বঙ্কিমবাবুও তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস দুটিতে (কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ) বাদ দিতে পারেন নাই। তুমি আমার "পথনির্দেশ"-কেই কটাক্ষ করিয়া বোধ করি বলিয়াছ। বুঝিতেছি ওটা তোমার ভালো লাগে নাই। তাই যদি সত্য হয়, আমার উপদেশ এই, আর উপন্যাস গল্প প্রভৃতি লিখিতে চেষ্টা ত নিশ্চয়ই করিবে না, পড়াও

উচিত হইবে না। এক একটা পেণ্টার যেমন কালার ব্লাইণ্ড থাকেন, তুমিও তাই।…পরিশ্রমের হিসাবে, রুচির হিসাবে, আর্টের হিসাবে "পথনির্দেশে"র কাছে "রামের সুমতি"র স্থান নীচে। অনেক নীচে। …যাক। "চরিত্রহীন" ফিরিয়া পাঠাইয়ো।…অঙ্গবিশেষ যে খুলিয়া লোকের গোচর করিতে নাই, তাহা জানি, কিন্তু ক্ষতস্থান মাত্রই যে দেখাইতে নাই জানি না।…শুধু সৌন্দর্য সৃষ্টি করা ছাড়াও উপন্যাস-লেখকের আরো একটা গভীর কাজ আছে। সে কাজটা যদি ক্ষত দেখিতেই চায়—তাই করিতে হইবে। অস্টেন, মারি করেলি প্রভৃতি এবং সারা গেণ্ড্ সমাজের অনেক ক্ষত উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, আরোগ্য করিবার জন্য, লোককে শুধু-শুধু ভয় দেখাইয়া আমোদ করিবার জন্য নয়।…বদনাম যে হইবে তাহার নমুনা পাইতেছি, কিন্তু জানই ত, ভয়ে চুপ ক'রে যাওয়া আমার স্বভাব নয়।…গল্প লিখিয়া তোমাদের মনোরঞ্জন করিতে পারিব, সে আশা আমি আজ সম্পূর্ণ ত্যাগ করিলাম।…আশাকরি ফিরৎ ডাকে "চরিত্রহীন" পাঠাইবে।… ওটা "যমুনা"তেই বাহির হইবে।…"চোখের বালি" তার নিন্দার কারণ বিনোদিনী ঘরের বৌ। তাকে নিয়ে এতখানি করা ঠিক হয় নাই। এটায় বাড়ীর ভিতরের পবিত্রতার উপরে যেন আঘাত করিয়াছে। যেমন পাঁচকড়ির "উমা"। আমি ত এখনো কাহারো পবিত্রতায় আঘাত করি নাই ; পরে কি করিব কি জানি!…তোমাদের পোষা লেখকগুলিকে যদি অমন ফরমাস্ দিয়া লেখাও, আর প্রতি পদে ওভারসিয়ার-এর মতো লেভেল দড়ি হাতে মাপজোক করতে যাও, সমস্ত লেখাই আড়ষ্ট হবে।…পাদরিদের হিম্ বা গির্জার প্রেয়ার শুধু যদি নিজেদের কাগজটাকে করে তোল সে টিকসই হবে কি?…কি জানি এত বড় দীর্ঘ পত্র লিখিয়া তোমাকে ব্যথা দিলাম, কি, কি করিলাম। আমিও ব্যথা পাইয়াছি। তুমি যে লিখিয়াছ "চরিত্রহীন" অপরের নামে প্রকাশ করিতে এইটাতেই সবচেয়ে বেশি। আমি কি

এতই হীন? যা আমার মন্দ জিনিস তাকে বেশি ক'রেই আমার নামের আশ্রয় দেওয়া চাই। তা না করিয়া একটা ফিক্‌টিশাস নামে (নিজের নাম বাঁচাইবার জন্য) চালাইব? ভালো মন্দ যাই হোক কন্সিকোয়েন্স আমার ভোগ করা চাই। নাম আবার কি? কে এর লোভ করে? সে লোভ থাকিলে ভায়া, এতদিন চুপ করিয়া নষ্ট করিতাম না।...'

'চরিত্রহীন' যে পাঠকসমাজে আলোড়ন আনবে এবং এর বিরুদ্ধে একদল সমালোচক খড়্গহস্ত হয়ে উঠবে, এটা গোড়া থেকেই আন্দাজ করে 'যমুনা'-সম্পাদকের কাছে শরৎচন্দ্র এই সময় এক চিঠিতে লিখলেন:

'ইংরাজী সাহিত্যে যা-কিছু বাস্তবিক ভালো তাতে এর চেয়ে ঢের বেশি ইম্‌মরাল ঘটনার সাহায্য লওয়া হইয়াছে।...ভালো বই, যাহা আর্ট হিসাবে—সাইকোলজি হিসাবে বড় বই, তাহাতে দুশ্চরিত্রের অবতারণা থাকিবেই থাকিবে।...পাঁচজনকে যদি বাস্তবিক শিখাইতে পারা যায়, গোঁড়ামির অত্যাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে কথা বলা যায়, তার চেয়ে আনন্দের বস্তু আর কি আছে? আজ লোকে আমাদের মতো ক্ষুদ্র লোকের কথা না শুনিতে পারে, কিন্তু একদিন শুনিবেই।... একদিন এই সঙ্কল্প করিয়াই আমি সাহিত্যসভা গড়িয়াছিলাম, আজ আমার সে সভাও নাই, সে জোরও নাই!'

'ভারতবর্ষ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সম্পাদনা অসম্পূর্ণ রেখেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে চিরবিদায় নিতে হল। শেষ পর্যন্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও রায়বাহাদুর জলধর সেনের ওপর সে ভার অর্পিত হল।

'চরিত্রহীন' সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত উপেক্ষা করে ফণীন্দ্রনাথ পাল ১৩২০ সালের কার্তিক সংখ্যার 'যমুনা'য় তার প্রথম কিস্তি পত্রস্থ করলেন। শরৎচন্দ্রের সর্বপ্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'বড়দিদি' এই সময় ফণীবাবুই প্রকাশ করলেন।

‘চরিত্রহীন’ মাসে-মাসে ‘যমুনা’য় যখন প্রকাশিত হচ্ছিল, প্রমথবাবু তখন ‘ভারতবর্ষে’ লেখার জন্যে বিস্তর পীড়াপীড়ি করে শরৎচন্দ্রকে চিঠি লিখছিলেন। অনুরোধ এড়াতে না পেরে শরৎচন্দ্র তাঁর কাছে ‘বিরাজ বৌ’ গল্পের পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দিলেন।

১৩২০ সালের পৌষ-মাঘ সংখ্যার ‘ভারতবর্ষে’ শরৎচন্দ্রের ‘বিরাজ বৌ’ প্রকাশিত হল। ‘ভারতবর্ষে’ এই তাঁর প্রথম লেখা।

এর পর ছমাসের মধ্যে পুস্তকাকারে ‘বিরাজ বৌ’ প্রকাশিত হল। এটাই হল তাঁর দ্বিতীয় মুদ্রিত গ্রন্থ।

‘বিরাজ বৌ’-এর পাণ্ডুলিপি পাঠানোর সময় শরৎচন্দ্র প্রমথবাবুকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন :

‘...গল্পটা একটু মন দিয়া পড়িয়ো এবং ইম্‌মরাল ইত্যাদি ছুতা করিয়া রিজেক্ট্ করিও না। তাও যদি কর, কাহাকেও রিজেক্ট করার কারণ দর্শাইয়ো না। আমার “চরিত্রহীন” তোমাদের বদনামের গুণে সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বসিয়াছে।...আমি জিজ্ঞাসা করি কি আছে ওতে ? একজন ভদ্রঘরের মেয়ে যে-কোন কারণেই হোক, বাসায় ঝি-বৃত্তি করিতেছে—আর একজন ভদ্র যুবা তারই প্রেমে পড়িতেছে—অথচ শেষ পর্যন্ত এমন কোথাও প্রশ্রয় পাইতেছে না অথচ রবিবাবুর “চোখের বালি” ভদ্রঘরের বিধবা নিজের ঘরের মধ্যে এমন কি আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যে নষ্ট হইতেছে—কেহ কথাটি বলে নাই ! (কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণীকে মনে পড়ে ?) “মানসী”তে প্রভাতবাবু, এক ভদ্র যুবার মুখে আর এক ভদ্র বিধবার সতীত্ব হরণের মতলব আঁটিতেছেন !...কোনো দোষ নাই কেন না নাম “রত্নদীপ” ! তোমাদের “সূরজ কওর”...!’ ইতিপূর্বে ‘ভারতবর্ষে’ প্রকাশিত এই গল্পটি পড়ে প্রমথবাবুকে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন—‘...তোমাদের এবারের কাগজ পড়িয়া গোটা দুই প্রশ্ন মনে হইয়াছে...। ১ম সূরজ কওর সম্বন্ধে। সূরজ কওর বেশ্যা এবং খুনে। হরি সিংকে একস্থানে

বলিতেছে—"এই ত দরশ পরশ হইল। আমি যে কাজ বলিয়াছি করিয়া আইস তখন আমার অদেয় আর কিছুই থাকিবে না।"... ইতিপূর্বে, নির্জন ঘরে বেশ্যা সূরজ "হাসিয়া মুখে কাপড় দিয়াছে" এবং "চোখে প্রেমের আহ্বান করিয়াছে" এবং "হরিসিং আঁচল ধরিয়া ওড়না টানাটানি করিয়াছে।" কি প্রমথ, অস্বীকার করিবে সমস্ত গল্পের ড্রিফ্‌ট্‌টা কি? অনাবৃত রূপ সে শুধু জানিয়া শুনিয়া মঙ্গল সিংকেই দেখায় নাই—পাঠককেও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহাতে ছবি দিয়া জিনিসটি বেশ ফুটিয়াছে! সাবাস!! "তবে দেখ! রূপ দেখ!" অনেকেই তাহা দেখিতে পাইয়াছে।'

'২। ১৯৩ পাতা—"অন্ধকার বৃন্দাবন"। চতুর্থ স্ট্যান্‌জা—"করে না দধি মন্থ গোপী নাচায়ে কটি চন্দ্রহার"। কটির চন্দ্রহার নাচিয়ে নাচিয়ে দধি মন্থ করলে, দেখতে পুরুষ মানুষের বোধ করি বেশ ভালোই লাগে। চোখ বুজিয়া একবার উচ্চাঙ্গের ভাবটা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করিও, সুখ পাবে। তাছাড়া গোপীর মধ্যে যশোদাও আছেন। উপানন্দের স্ত্রীটিও "দধি মন্থ" করতেন, চন্দ্রহারও পরতেন। কৃষ্ণচন্দ্রকে কটি নাচিয়ে দেখাতে পাচ্ছেন না ব'লে তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়ে আছেন দেখ্‌ছি!...তৃতীয় স্ট্যান্‌জা—"যমুনা জল শিহরে, শুনি বাঁশীটি শ্যাম চন্দ্রমার"। শ্যামচাঁদটি তখন কোথায় শুনি? বোধ করি মথুরা থেকে ব্যাগপাইপ বাজাচ্ছিলেন, না হলে অত দূরে বৃন্দাবনের যমুনা-জল শিহরে কি ক'রে? অত দূরে আর একটা জেলা থেকে বাঁশি বাজালে? তবে, দেবতার কথা বলা যায় না, ওঁরা জাহাজের বাঁশির মতো ইচ্ছা করলে বাজাতে পারেন। সম্ভব বটে!...আরো একটু মন দিয়ে "ভারতবর্ষ" পড়ি, তারপরে "আশ্বিন" সংখ্যায় "সাহিত্যে" একটি বিরাট সমালোচনা লিখব। সমাজপতিও কিছু লিখে দেবার জন্য ঘন ঘন রেজিস্টার্ড লেটার এবং টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছেন, তাঁর কথাটাও রাখা হবে।...আমারও একটা নজির হয়ে রইল। "চরিত্রহীন"

প্রকাশ করার সময় লোকের মুখ সহজেই বন্ধ করবার উপায়ও হবে। আমি বিদ্রূপ করলে কিরূপ করি তা জানই—এমনি ক'রে প্রতি ছত্রে প্রতি পাতা তুলে ধ'রে এক্স্‌পোজ করব।'

'…"বিরাজ বৌ" সম্পর্কে এইটুকু আবেদন করিলাম।…এ গল্পটা তোমাদের কাছে ইম্‌মরাল বলিয়া মনে হইয়াছে কিনা। যদি হয়, আর কাহাকেও না দেখাইয়া চুপি চুপি রেজিস্টার্ড ফিরিয়া পাঠাইবে।'

'যমুনা'-সম্পাদক এদিকে 'ভারতবর্ষে' শরৎচন্দ্রের লেখা প্রকাশিত হতে দেখে চঞ্চল হয়ে পড়লেন। ১৩২১ সালের আষাঢ়-সংখ্যার 'যমুনা'র বিজ্ঞপ্তি বেরিয়ে গেল :

'যমুনা'র পাঠকগণ বোধহয় শুনিয়া সুখী হইবেন যে, সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বর্তমান মাস হইতে যমুনার সম্পাদন-কার্যে যোগদান করিলেন।

শ্রাবণ-সংখ্যায় অন্যতম সম্পাদক হিসেবে শরৎচন্দ্রের নাম মুদ্রিত হল।

এই সময় পর-পর তিন মাসে শরৎচন্দ্রের তিন-তিনটি বই প্রকাশিত হল। 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি' ও 'পথনির্দেশ' গল্প তিনটি নিয়ে প্রথমে 'বিন্দুর ছেলে' তারপর 'পরিণীতা' ও 'পণ্ডিত মশাই'।

'যমুনা'য় তখন শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল এবং সেই সঙ্গে তিনি 'গৃহদাহ' উপন্যাস রচনায়ও হাত দিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে শরৎচন্দ্র দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেছেন।

হিরণ্ময়ী দেবী মানুষটি খুব সরল। যেমন ধর্মপ্রাণ, তেমনি মমতাময়ী। মেদিনীপুরে তাঁর বাপের বাড়ি। বাবা কৃষ্ণদাস অধিকারী। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব কাউকে না জানিয়ে শরৎচন্দ্র এই বিবাহ করেন।

বিয়ে করেই সস্ত্রীক রেঙুনে চলে যাওয়ায় পরিচিতদের অনেকেই তাঁর এই বিয়ের খবর জানতেন না।

আর রেঙুনের সেই নোংরা গলিতে নয়, এবার আরেকটু ভালো পাড়ায় গুছিয়ে সংসার পাতলেন।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই শরৎচন্দ্রের শরীরটা বেঁকে বসল। অর্শ, আমাশয়, জ্বর, বাত—নানা রোগের উপসর্গ। তার ওপর আপিসে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। নতুন সাহেব অফিসার এসে হাড়মাস জ্বালিয়ে খেতে লাগল।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বাধ্য হয়ে কিছুদিনের ছুটি নিয়ে শরৎচন্দ্রকে সস্ত্রীক কলকাতায় চলে আসতে হল। সঙ্গে এল প্রভুভক্ত ভেলি কুকুর।

শরৎচন্দ্র চোরবাগানে এক বাসায় এসে উঠলেন।

খবর পেয়ে বন্ধুবান্ধবরা এলেন। রোজ সন্ধ্যেয় সেখানে সাহিত্যের মজলিশ। পুরনোরা ছাড়াও নতুনদের মধ্যে আসতে লাগলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়। প্রমথনাথ তখন পাথুরেঘাটার রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের একান্ত-সচিবের কাজ ছেড়ে পোর্ট হেল্‌থ অফিসে কাজ করছিলেন। তাঁকে দিয়ে 'ভারতবর্ষে'র সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সম্পর্কটা পাকাপোক্ত করবার চেষ্টা চলতে লাগল।

হঠাৎ একদিন আপিস থেকে জরুরী ডাক পেয়ে শরৎচন্দ্রকে তাড়াতাড়িতে একাই রেঙুনে ফিরে যেতে হল। যতদিন না তাঁর স্ত্রীকে কারো সঙ্গে রেঙুনে পাঠাবার ব্যবস্থা করা গেল, ততদিন প্রমথনাথবাবুই কলকাতার বাসা দেখাশুনা করবার ভার নিলেন।

'যমুনা'য় তখনো 'চরিত্রহীন' প্রকাশিত হচ্ছিল।

কিন্তু 'যমুনা'র সম্পাদক ফণীবাবুর সন্দেহবাতিক দাঁড়িয়ে গেল,

শরৎচন্দ্র বুঝি তাঁর ছোট কাগজ ছেড়ে বরাবরের জন্যে 'ভারতবর্ষে' চলে যাবেন। শরৎচন্দ্র তাঁকে বহুবার বহু রকমে আশ্বাস দিয়েছিলেন; বিভূতি ভট্ট, নিরুপমা দেবী, সুরেন গঙ্গোপাধ্যায়, গিরীন গঙ্গোপাধ্যায়, যোগেশ মজুমদার এবং পরিচিত আরও অনেক সাহিত্যিককে 'যমুনা'য় লিখতে উৎসাহিত করেছিলেন। কিন্তু এত করেও ফণীবাবুর সন্দেহ ঘোচানো যখন সম্ভব হল না, তখন 'চরিত্রহীন' প্রকাশ বন্ধ করে দিয়ে 'যমুনা'র সঙ্গে শরৎচন্দ্র সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন।

তারপর থেকে শরৎচন্দ্র নিয়মিত 'ভারতবর্ষে' লিখতে আরম্ভ করলেন। 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদক তখন জলধর সেন ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।…'

১৩২২ সালের আশ্বিন-সংখ্যা থেকে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'পল্লীসমাজ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে লাগল। অগ্রহায়ণ মাসে 'মেজদিদি' গল্প-সংকলন ও মাঘ মাসে 'পল্লীসমাজ' উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল। 'পল্লীসমাজ' প্রকাশিত হওয়ার পর একদল সমালোচক খুবই খড়্গহস্ত হলেন। যতীন্দ্রমোহন সিংহ তাঁর 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' গ্রন্থে 'পল্লীসমাজে'র বিধবা রমাকে বিদ্রূপ করে লিখলেন, 'তুমি ঠাকুরাণী বুদ্ধিমতী না? বুদ্ধিবলে তোমার পিতার জমিদারী শাসন করিতে পারিলে, আর তুমিই কিনা তোমার বাল্যসখা পরপুরুষ রমেশকে ভালবাসিয়া ফেলিলে? এই তোমার বুদ্ধি? ছি!…'

তরুণ সমাজ এই সমালোচনায় ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর নাম দেয় 'সাহিত্যের স্যানিটারী ইন্‌স্পেক্টর'।

পরে শরৎচন্দ্র একবার এ নিয়ে মন্তব্য করে বলেছিলেন, 'এ ধিক্কার আর্ট-এর নয়, এ ধিক্কার সমাজের, এ ধিক্কার নীতির অনুশাসনের।'

লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে এ সম্বন্ধে লিখেছিলেন, 'অনেকগুলি বড় এবং সুন্দর জীবন শুধু বিধবা-বিবাহ সমাজে না থাকার জন্যই চিরদিনের জন্য ব্যর্থ নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে।…'

শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, '···কল্পনা কোনোদিনই বাস্তব হয়ে দেখা দেয় না। দেয় না বলেই তার প্রতি আমাদের লোভ এত বেশি। তার জন্য আমরা মরি তবু তাকে জীবন থেকে বাদ দিতে পারিনে।··· অসংযমী মনের উপর প্রভুত্ব করা বড় শক্ত। এমন কত পুরুষের মন কত নারীর মনকে গোপনে চেয়ে এসেছে তার সংখ্যা করা যায় না। মনের কোণে থাকে কলুষ-কামনা-ব্যাধি, সাধুতার অন্তঃস্থলে থাকে জমাটবাঁধা পশুত্ব। মানুষ তাহা সহজে টের পায় না। যখন টের পায় তখন তার সাধ্যের অতীত।'

দিলীপকুমার রায়কে লিখেছিলেন, '···জীবনে যে ভালোবাসলে না, কলঙ্ক কিনলে না, দুঃখের ভার বইলে না, সত্যিকার অনুভূতির অভিজ্ঞতা আহরণ করলে না, তার পরের-মুখে ঝাল খাওয়া কল্পনা সত্যিকার সাহিত্য কতদিন জোগাবে? নাক-টেপা প্রাণায়ামের যোগবলে আর-যা-কিছুই হোক, এ বস্তু হবে না। নিজের জীবনটাই হল যার নীরস, বাঙলা দেশের বালবিধবার মতো পবিত্র, সে প্রথম যৌবনের আবেগে যত কিছুই করুক, দুদিনে সব মরুভূমির মতো শুষ্ক শ্রীহীন হয়ে উঠবে।···সবচেয়ে জ্যান্ত লেখা সেই, যা পড়লে মনে হবে গ্রন্থকার নিজের অন্তর থেকে সব কিছু ফুলের মতো বাইরে ফুটিয়ে তুলেছে। দেখোনি বাঙলা দেশে আমার সব বইগুলোর নায়ক-নায়িকাকেই ভাবে এই বুঝি গ্রন্থকারের নিজের জীবন, নিজের কথা। তাই সজ্জন-সমাজে আমি অপাঙক্তেয়। কতই না জনশ্রুতি লোকের মুখে-মুখে প্রচলিত।'

১২

বহু বছর পরের ঘটনা। শরৎ-সাহিত্যের বিজয়-জয়ন্তী তখন।

কাশীতে সেবার প্রবাসী বাঙালীদের উদ্যোগে শরৎচন্দ্রকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছে।

শরৎচন্দ্র উঠেছেন 'উত্তরা'-সম্পাদক সুরেশ চক্রবর্তীর বাড়িতে।

খুব ঘটা করে সভা হল।

সভা শেষ হবার পর বিশ-বাইশ বছরের একটি মেয়ে এসে শরৎচন্দ্রের পদধূলি নিল। মেয়েটির নিটোল স্বাস্থ্য ; যেমন রঙ, তেমনি মুখশ্রী। পরনে শাদা থান। চুল ছোট করে ছাঁটা। দেখেই বালবিধবা বলে মনে হয়।

মেয়েটি বলল, 'আপনি আমার গুরু, আপনার "চরিত্রহীন" আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে।'

শরৎচন্দ্রের দিকে এমনভাবে অসঙ্কোচে চোখ তুলে মেয়েটি কথাগুলো বলে গেল, যেন তিনি তার অনেকদিনের চেনা।

শরৎচন্দ্র বিস্ময়ে হতবাক। কী বলবেন কিছুই ঠিক করতে পারছেন না।

মেয়েটির সঙ্গে এসেছিলেন তার বর্ষিয়সী দিদিমা। দিদিমাকে একটু এগিয়ে যেতে অনুরোধ করে মেয়েটি বলতে লাগল : 'আপনার দেখা পাব, স্বপ্নেও ভাবিনি। ভাগ্যের জোরে দর্শন যখন মিলল, আমার সমস্ত কথা আপনাকে শুনতে হবে। নইলে শান্তি পাব না।'

শরৎচন্দ্র সাগ্রহে রাজী হলেন।

মেয়েটি শুরু করল :

'আমি দুবছর বয়সে মাকে হারাই। সেই থেকে বাবার

কাছেই মানুষ। বাবা বাইরের এক কলেজে প্রফেসারি করেন।

'সতেরো বছর বয়সে বাবা আমার বিয়ে দিয়ে দেন। কিন্তু এমনি কপাল যে, বিয়ের ছমাস যেতে না যেতেই তিন দিনের জ্বরে আমার স্বামী এই কাশীধামেই দেহ রাখলেন।

'আমি ছিলাম বাবার খুব আদুরে মেয়ে। যাতে আমি ভুলে থাকি তার জন্যে বাবা আমার পড়াশুনার ব্যবস্থা করলেন।

'আমাকে পড়াবার ভার নিল বাবারই এক প্রিয় ছাত্র। বাবা তাকে নিজের ছেলের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন।

'ছেলেটি দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি তার চমৎকার স্বাস্থ্য। দেড় বছর মেলামেশার ভেতর দিয়ে, আমাদের পরস্পরকে পরস্পরের এত ভালো লেগে গেল যে, একদিনের অদর্শনও আমাদের সহ্য হত না।

'বাবার কাছ থেকে আমি কিছুই লুকোবার চেষ্টা করতাম না। হঠাৎ কেন জানি না, আমাকে পড়াতে পারবে না বলে ছেলেটি একদিন গম্ভীর মুখে আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গেল।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেয়েটি আবার শুরু করল :

'কদিন পর কেন যেন বিরক্ত হয়ে বাবা আমাকে বরানগরে আমার মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। দূর থেকে তখন চিঠি লেখালেখি শুরু হল। ছেলেটি শেষ পর্যন্ত কলকাতায় চলে আসায় আবার তার সঙ্গে নিয়মিত দেখাশুনা আরম্ভ হল। মামার বাড়িতে নানা বাধা। তাই তখন আমার একমাত্র চেষ্টা হল কোথাও পালিয়ে যাবার।

'শেষ পর্যন্ত দিনও স্থির করে ফেললাম। রাত দুটোয় এসে ছেলেটি আমাকে ডাকবে। তারপর আমরা যেখানে দুচোখ যায় চলে যাবো।

'সেদিন সারাটা দিনমান ভারি ভয়ে-ভয়ে কাটল। রাত্রে যদি ঘুমিয়ে পড়ি ? ছেলেটি যদি সাড়া না পেয়ে ফিরে যায় ?

'তাই ঘুম তাড়াবার জন্যে মামাতো ভাইকে দিয়ে বিকেলে লাইব্রেরী থেকে লুকিয়ে একটা বই আনিয়ে নিলাম। বইটার নাম "চরিত্রহীন"।

নাম দেখে ভারি রাগ হয়েছিল লেখকের ওপর। নামটা কাঁটার মতো বিঁধছিল। সবাই শুয়ে পড়বার পর ঘরের দরজা বন্ধ করে বইটা গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম। রাত একটা নাগাদ বই শেষ হল।

'ততক্ষণে কিরণময়ী আমার ভেতরটা একেবারে তোলপাড় করে তুলে আমাকে শক্ত মাটির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আমার মনে আর কোনো অস্থিরতা নেই। অনেকদিন পর এই প্রথম মনে আমি শান্তি পেলাম।

'ঠিক তুটোর সময় দরজায় টোকা পড়তেই ধড়মড় করে উঠে আমি দরজা খুলে দিলাম। তারপর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই বললাম—আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো, আমি যেতে পারব না।

'ছেলেটি আকাশ থেকে পড়ল—সে কী কথা! টিকিট কেনা হয়ে গেছে, সমস্ত ঠিকঠাক…। আমি বললাম—অন্যায় করেছি, আমায় ক্ষমা করো।

'সে খুব রাগ করল—এই যদি তোমার মনে ছিল, কেন আমায় এত দূরে মিথ্যে-মিথ্যে টেনে আনলে? তোমাদের কি মন বলে কিছু নেই? ভালোবাসার কি…

'বললাম—ভালোবাসা আমার সত্যি, কোনোদিনই আর মিথ্যে হবে না। কারণ, ভালোবাসা কী, তা আজই আমি জেনেছি। জেনেছি বলেই তোমার সঙ্গে আজ আমার যাওয়া হল না।

'ছেলেটিকে চলে যেতে দেখে কী খারাপ যে লাগছিল বলার নয়। সেদিন আমি অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছিলাম বটে, কিন্তু অনেকদিন পর সেই প্রথম খুব সোয়াস্তির সঙ্গে ঘুমিয়েছিলাম।'

একটু থেমে শরৎচন্দ্রের উজ্জ্বল চোখের দিকে চেয়ে মেয়েটি বলল, 'এমনি লেখারই প্রয়োজন ছিল আমার জন্যে। কত মেয়ে যে এমনি ভাবে কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে, মনের চঞ্চলতায় খেই হারিয়ে ফেলছে—তা আমার মতো ভুক্তভোগীরাই শুধু জানে।

'এই ঘটনার তিন-চারদিন পরেই আমি দিদিমার সঙ্গে এখানে চলে আসি। সেও প্রায় এক বছর হতে চলল। সেই থেকে আপনাকে দেখবার আমার ভারি ইচ্ছে ছিল।'

যাবার সময় মেয়েটি শরৎচন্দ্রকে আর একবার প্রণাম করল।।

সে রাত্রে শরৎচন্দ্রের ঘুম আসতে খুব দেরি হল।

পুরনো দিনগুলো মনে পড়ছিল। ফিরে গেলেন পুরনো যুগে।

শরৎচন্দ্র তখন রেঙ্গুনে।

বন্ধু প্রমথনাথ রোগাক্রান্ত হয়ে চাকরি ছেড়ে মধ্যভারতের ছত্রপুর অঞ্চলে গিয়েছিলেন হাওয়া বদলের জন্যে। কিন্তু স্বাস্থ্যের দিন-দিন অবনতি হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তাঁকে যুক্তপ্রদেশের ভাওয়ালী স্বাস্থ্য-নিবাসে আশ্রয় নিতে হল। এদিকে তাঁর সংসারের অবস্থা অর্থাভাবে অচল হয়ে পড়ল। প্রমথনাথের চিকিৎসা বন্ধ হবারও আশঙ্কা দেখা দিল।

শরৎচন্দ্র চিঠিপত্রে সমস্ত খবর রাখতেন। শেষ পর্যন্ত বন্ধুকে সাহায্য করবার এক উপায় বার করলেন। 'কাশীনাথ' বইটির গ্রন্থস্বত্ব বন্ধু প্রমথনাথকে দান করে হরিদাসবাবুকে তিনি একটি দানপত্র পাঠিয়ে দিলেন।

চলচ্চিত্রের ছবির মতো একের পর এক ভেসে উঠছে জীবনের সহযাত্রীদের মুখ। সে মুখগুলো ভোলা যায় না।

যে সময়ে 'ভারতবর্ষে' 'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী' শিরোনামায় 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে ছদ্মনামে প্রকাশিত হচ্ছিল, সেই সময় হরিদাসবাবুর এক চিঠির জবাবে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন :

'. ওটা কি ? অবশ্য শ্রীকান্তর আত্মকাহিনীর সঙ্গে কতকটা সম্বন্ধ তো থাকিবেই···। তবে "আমি"-"আমি" নেই। অমুকের সঙ্গে শেক-

হ্যাণ্ড করিয়াছি, অমুকের গা ঘেঁষিয়া বসিয়াছি—এসব নেই।...'

'শ্রীকান্ত' তো সেই জীবনেরই টুকরো-টুকরো কাহিনীর মালা-গাঁথা।

এক রাত্রে এই মালা গাঁথতে-গাঁথতে দরজায় পায়ের শব্দ শোনা গেল।

'কে?' লেখা বন্ধ করে দরজার দিকে শরৎচন্দ্র এগিয়ে গেলেন।

'আরে, যোগীন ভায়া যে! কী খবর? মামদো সায়েবের কোনো নতুন খবর নিয়ে এলে নাকি? নাঃ, এ পোড়া দেশটা ছাড়তে পারলে—'

পেছনে ছিলেন গিরীনবাবু। তিনি বাধা দিয়ে বললেন, 'উপস্থিত তো তোমায় ছেড়ে দিতে পারছি না, শরৎদা।'

'ওঃ হো, গিরীনও যে এসেছ দেখছি। কী, ব্যাপার কী? এত রাত্রে?'

'খুব ভালো খবর আছে, শরৎদা—' বসতে-বসতে যোগীনবাবু বললেন। গিরীনবাবুই কথাটা শেষ করলেন, 'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ আসছেন রেঙ্গুনে।'

শরৎচন্দ্রের সে কী আনন্দ।

রবীন্দ্রনাথ জাপান হয়ে আমেরিকা যাবার পথে দুদিন রেঙ্গুনে থাকবেন। ৭ই ও ৮ই মে।

৮ই মে বাংলায় ২৫শে বৈশাখ। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। কাজেই যোগাযোগটা খুব ভালোই হল।

'রেঙ্গুন বেঙ্গল সোশাল ক্লাব'-এর পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা জানাবার ব্যবস্থা হল।

উদ্বোধন সঙ্গীত গাইবার ও অভিনন্দন পত্র লেখবার ভার শরৎচন্দ্রের ওপরই পড়ল। গাইতে রাজী হলেও অভিনন্দন পত্র সভায় দাঁড়িয়ে পড়তে কিছুতেই তাঁকে রাজী করানো গেল না। ব্যারিস্টার নির্মল সেনের ওপর ভার দেওয়া হল অভিনন্দন পত্র পড়বার।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কদিন খুব হৈ চৈ করে কাটল।

তারপরই শরীরটা এমন গোলমাল বাধাতে লাগল যে, বর্মাদেশে আর কিছুতেই থাকা চলল না।

সবচেয়ে মুশকিল হল ডান পা-টাকে নিয়ে। বাতে প্রায় পঙ্গু হবার দাখিল। চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় যাওয়া দরকার। আপিসেও সাপে-নেউলে অবস্থা। ফলে, লেখাও এগোচ্ছে না।

শেষ পর্যন্ত হরিদাসবাবুর সঙ্গে ঠিক হল, শরৎচন্দ্র লম্বা ছুটি নিয়ে কলকাতায় চলে আসবেন এবং তাঁর লেখা ও গ্রন্থাবলী বাবদ হরিদাসবাবু মাসে একশো টাকা করে তাঁকে দেবেন।

কলকাতায় চলে আসার খরচ বাবদ হরিদাসবাবুর কাছ থেকে আগাম তিনশো টাকা পাওয়া গেল।

রেঙ্গুন ছেড়ে আসা কি সহজ? এতদিনের এত ভালোবাসা, এত সহানুভূতি, এত দরদ—বন্ধন ছিঁড়তে প্রাণ ফেটে যায়। মিস্ত্রিপাড়ার গরীব মানুষগুলোর চোখ ছল-ছল করে উঠল।

বেঙ্গল সোশাল ক্লাবে বিদায়-সম্বর্ধনা হল। সবচেয়ে করুণ দেখাচ্ছিল যোগেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথকে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত জাহাজের বাঁশিই তাঁকে রেঙ্গুনের মাটি থেকে ছিনিয়ে নিল।

বন্দর দূর থেকে দূরতর হতে-হতে এক সময় একেবারে মিলিয়ে গেল।

চতুর্থ অধ্যায়

১

হাওড়ার বাজেশিবপুর অঞ্চলে ৬নং নীলকমল কুণ্ডু লেনের বাসায় শরৎচন্দ্র বেশ জাঁকিয়ে বসলেন।

অষ্টপ্রহর শুধু সাহিত্যসাধনা। 'ভারতবর্ষে' নিয়মিত তাঁর লেখা বেরোচ্ছে।

রেঙুন ছেড়ে আসার আগেই 'চন্দ্রনাথ', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'অরক্ষণীয়া', 'শ্রীকান্ত—১ম পর্ব', 'দেবদাস' প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর একে-একে 'নিষ্কৃতি', 'চরিত্রহীন', 'কাশীনাথ', 'স্বামী', 'দত্তা' ও 'শ্রীকান্ত-২য় পর্ব' প্রকাশিত হল।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শেষদিকে 'বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে'র উদ্যোগে শরৎ-গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হতে শুরু করল।

শরৎসাহিত্য তখন বাঙলাদেশের মন অধিকার করে বসেছে। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, রসরাজ অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ মনীষীদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের যোগাযোগ হল। প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিক ও সম্পাদকেরা প্রায়ই তখন শরৎচন্দ্রের কাছে যেতেন।

শুধু নিজের বাড়িতে নয়, তাঁর আড্ডা ছিল বহু জায়গায় ছড়ানো। 'ভারতবর্ষ', 'ভারতী' প্রভৃতি মাসিকপত্রের অফিসে তাঁকে ঘিরে সাহিত্যিকদের মজলিস বসত। শুধু লেখা নয়, জমিয়ে গল্প বলবারও অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর। শরৎচন্দ্র তাঁর দেশবিদেশে ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলতেন। একদিকে তাঁর আসরে এসে বসতেন হেমেন্দ্রকুমার রায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, অমল হোম, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ

অনেকে, অন্যদিকে 'কল্লোল'-এর আধুনিকের দল শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে।

শরৎচন্দ্র ছিলেন সমস্ত দলের সাহিত্যিকদের মধ্যেকার সেতু।

রাজনৈতিক আকাশে তখন ঘনঘটা। বিদেশী, দাসত্বের বিরুদ্ধে স্বদেশী সৈনিকদের মধ্যে সাজ-সাজ রব।

বাঙলাদেশে সে সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দিকপাল নেতা। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ভবানীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে তিনি সভাপতি হবার পর থেকেই শরৎচন্দ্র তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অল্পদিনের মধ্যে দেশবন্ধুর কাছে আসার সুযোগও মিলে গেল।

দেশবন্ধুর ডাক শরৎচন্দ্র উপেক্ষা করতে পারলেন না।

সে সময় দেশবন্ধুর সম্পাদনায় 'নারায়ণ' পত্রিকা বার হত। দেশবন্ধুর অনুরোধে শরৎচন্দ্র তাতে 'শিক্ষার বিরোধ', 'মহাত্মাজী' এবং আরও অনেক রাজনৈতিক প্রবন্ধ লেখেন।

লেখার জন্যে পারিশ্রমিক দেবার নিয়ম ছিল। কিন্তু শরৎচন্দ্রকে কত দেওয়া যায় ঠিক করতে না পেরে দেশবন্ধু একবার তাঁকে টাকার ঘর খালি রেখে একটি চেক পাঠিয়ে দিলেন।

চেক ভাঙাবার সময় টাকার অঙ্ক লক্ষ্য করে একজন সকৌতুকে শরৎচন্দ্রকে বলেছিলেন, 'মাত্র একশো টাকা লিখলেন শরৎদা? ওতে তু পাঁচ হাজার টাকা স্বচ্ছন্দে বসিয়ে নিতে পারতেন। তাতে দাশ সাহেবের টাকায় এতটুকু টান পড়ত না।'

জবাবে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, 'তা হয়তো পড়ত না। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের সংস্পর্শে এসে চিত্ত কলঙ্ক করতে পারব না ভাই।'

দেশবন্ধুর ডাকেই শেষ পর্যন্ত দেশের কাজে শরৎচন্দ্রকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হল।

জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র জনতার ওপর ইংরেজের নিষ্ঠুর গুলি-গোলা বর্ষণে দেশ জুড়ে ক্রোধের ঝড় বইতে লাগল।

মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ শুরু করলেন।

বাঙলায় বিপ্লবীর দল রক্তের বদলে রক্ত নেবার জন্যে ক্ষেপে উঠল।

কলকাতায় গোরা পল্টনের বন্দুক মেশিনগানের সামনে বুক পেতে দাঁড়াল আবালবৃদ্ধবনিতার অকুতোভয় মিছিল।

শরৎচন্দ্রকে কলম ছেড়ে সেই মিছিলে দাঁড়াতে দেখা গেল।

প্রতিবাদ তখন শতমুখে গর্জে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' খেতাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে ইংরেজ সরকারকে সরোষে চিঠি লিখলেন। কাগজে-কাগজে রণধ্বনি ঘোষিত হল। লাহোরের দৈনিক 'ট্রিবিউনে'র সম্পাদক কালীনাথ রায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন।

'ট্রিবিউনে'র সঙ্গে তখন অমল হোম জড়িত ছিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁকে এক চিঠিতে লিখলেন :

'পরম কল্যাণীয়েষু অমল—"ভারতীর" আড্ডায় সেদিন শুনলাম তোমারও নাকি খুব ফাঁড়া গিয়েছে। ইংরেজের মারমূর্তি খুব কাছে থেকেই দেখে নিলে ভালো করে। এ একটা কম লাভ নয়। আমাদের মোহ কাটাবার কাজে এরও প্রয়োজন ছিল। দরকার মনে করলেই ওরা যে কত নিষ্ঠুর কতটা পশু হতে পারে, তা ইতিহাসের পাতাতেই জানা ছিল এতদিন—এবার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হ'ল।

'আর এক লাভ—দেশের বেদনার মধ্যে আমরা যেন নতুন করে পেলাম রবিবাবুকে। এবার একা তিনিই আমাদের মুখ রেখেছেন।

"নারায়ণের" সময় সি. আর. দাশ একদিন আমাকে বলেছিলেন যে, রবিবাবু যখন নাইটহুড নেন, তখন নাকি দাশসাহেব কেঁদেছিলেন। এখন একবার তাঁর দেখা পেলে জিজ্ঞাসা করতাম, আজ আমাদের বুক দশহাত কিনা বলুন।...'

১৯২০ খৃষ্টাব্দে দেশ জুড়ে শুরু হয়ে গেল অসহযোগ আন্দোলন। মুখে-মুখে তখন শুধু একমাত্র কথা: খাদি...চরকা...নুন। বিলিতি জিনিস বয়কট। দলে-দলে লোকে সরকারী চাকরি ছেড়ে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সুভাষচন্দ্র তখন সবে আই-সি-এস পাশ করেছেন। কিন্তু তাঁর চাকরি নেবার প্রবৃত্তি হল না। দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করলেন।

শরৎচন্দ্রও স্থির থাকতে পারলেন না। ঘরে বসে কাজ করতে কিছুতেই মন বসছে না। সংসারের দিকে নজর দেবার মতো তাঁর তখন মনের অবস্থা নয়। অভাব অনটন, দুঃখকষ্ট মাথায় নিয়ে তিনি ঘরের বাইরে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁকে ডাক দিয়েছে দেশ—দেশের জাতীয় কংগ্রেস।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র হাওড়া কংগ্রেসের সভাপতি হলেন। মহাত্মাজী, দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র—সকলেই তখন কারাগারে বন্দী। ইংরেজের চণ্ডনীতি বেড়াজালে সারা দেশকে ঘিরেছে।

গল্প-উপন্যাস লেখার চেয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা-উদ্বুদ্ধকারী প্রবন্ধ লেখবার দিকেই শরৎচন্দ্র বেশি ঝুঁকে পড়লেন। তাঁর এই সময়কার বিভিন্ন ভাষণ ও প্রবন্ধ একত্র করে পরে 'স্বদেশ ও সাহিত্য' এবং 'তরুণের বিদ্রোহ' গ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে 'গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনে' এক বিরাট সভায় সে সময়কার শিক্ষাবিধি সম্পর্কে 'শিক্ষার বিরোধ' নামে যে ভাষণ পাঠ করেছিলেন, পরে তাঁর বইতে তা সংকলিত হয়।

এই ভাষণে তিনি সেদিন বলেছিলেন: 'এতদিন এদেশে শিক্ষার

ধারা একটা নির্বিঘ্ন নিরুপদ্রব পথে চলে আসছিল। সেটা ভালো কি মন্দ এ বিষয়ে কারও কোনো উদ্বেগ ছিল না। আমার বাবা যা পড়ে গেছেন, তা আমিও পড়ব। এর থেকে তিনি যখন দু'পয়সা ক'রে গেছেন, সাহেব-সুবোর দরবারে চেয়ারে বসতে পেয়েছেন, হ্যাণ্ড্‌শেক করতে পেয়েছেন, তখন আমিই বা কেন না পারবো? মোটামুটি এই ছিল দেশের চিন্তার পদ্ধতি। হঠাৎ একটা ভীষণ ঝড় এল। কিছুদিন ধরে সমস্ত শিক্ষা-বিধানটাই বনিয়াদ সমেত এমন টলমল করতে লাগল যে, একদল বললেন পড়ে যাবে। অন্যদল সভয়ে মাথা নেড়ে বললেন, না, ভয় নেই—পড়বে না। এই নিয়ে প্রতিপক্ষকে তাঁরা কটু কথায় জর্জরিত করে দিলেন।···মানুষের শক্তি যত কমে আসে মুখের বিষ তত উগ্র হয়ে ওঠে।···

'শিক্ষার বিরোধ আসলে এইখানে। পশ্চিম ও পূর্বের শিক্ষার সংঘর্ষ ···শিক্ষার প্রণালী নিয়ে এই যে বিবাদ বিসম্বাদ—এর যথার্থ অন্তরায় কোথায়? ··পশ্চিমের বিদ্যার অনেক গুণ থাকতে পারে, কিন্তু··· আমাদের জ্ঞান, আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজ-সংস্থান, আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি সকলের প্রতি যদি সে শুধু অশ্রদ্ধাই জন্মিয়ে দিয়ে থাকে, তো···লুব্ধচিত্তে পশ্চিমের শুক্রাচার্যের পানে আমাদের না তাকানোই ভালো।···সুদীর্ঘকাল পশ্চিমের সংসর্গে···আমরা পেয়েছি কেবল এই শিক্ষা—যাতে নিজেদের সর্ব বিষয়ে অবজ্ঞা এবং তাদের যা কিছু সমস্তের পরেই আমাদের গভীর শ্রদ্ধা···। আর তাদের ভিতরের দ্বার এমন অবরুদ্ধ বলেই অবনতিও আজ আমাদের এত গভীর।··· কিন্তু যে-শিক্ষায় মানুষ সত্যকারের মানুষ হয়ে উঠতে পারে,—তা তারা আমাদের দেয়নি, দেবে না এবং আমার বিশ্বাস দিতে পারেও না। · এই ভ্রান্তিটা চোখ মেলে দেখবার আজ দিন এসেছে।···

'কিন্তু···বিদেশী ভাষার মিডিয়ামের স্থানে স্বদেশী ভাষায় লেকচারের আইন করলেই দুঃখ দূর হবে? দুঃখ কিছুতেই ঘুচবে না, যতক্ষণ না

সেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, যাতে দেশের বহির্মুখী বীতশ্রদ্ধ মন আর একবার অন্তর্মুখী ও আত্মস্থ হয়। মনের মিলনই বা কি, আর শিক্ষার মিলনই বা কি, সে কেবল হতে পারে সমানে সমানে শ্রদ্ধার আদান-প্রদানে। এমন কাঙালের মতো, ভিক্ষুকের মতো কিছুতেই হবে না। হলেও সে শুধু একটা গোঁজামিল হবে,—তাতে কল্যাণ নেই, গৌরব নেই, দেশকে সে কেবল হীনতা ও লাঞ্ছনাই দেবে, কোনো দিন মনুষ্যত্ব দেবে না···

'পশ্চিম জয়ী হয়েছে।···কিন্তু কেবলমাত্র জয় করেছে বলে এই জয় করার বিদ্যাটাও সত্য বিদ্যা, এ কথা কোনো মতেই মেনে নেওয়া যায় না। গ্রীস একদিন পৃথিবীর রত্নভাণ্ডার লুটে নিয়ে গিয়েছিল, রোমও তাই করেছিল।···কিন্তু সেটা সত্যের জোরেও নয়, সত্য হয়েও থাকেনি।···সংসারে জয় করা বা পরের কেড়ে নেওয়ার বিদ্যাটাকেই একমাত্র সত্য ভেবে লুব্ধ হয়ে ওঠাই মানুষের বড় সার্থকতা নয়।···জয় কি কেবল নির্ভর করে বিজেতার উপরেই ?··· হিন্দুস্থান দেশ হারিয়েছিল তার নিজের দোষে। সেই ত্রুটি সংশোধন করার বিদ্যে তার নিজের মধ্যেই ছিল, বিজেতার···কাছে শেখবার কিছুই ছিল না।···কিন্তু সত্যকার বিদ্যা যদি কিছু···বিজেতার থাকে···তার দ্বার পশ্চিমমুখো থাকায় তাকে···বয়কট করতে হবে ? ···পদার্থবিদ্যা···রসায়নশাস্ত্র···ধনবিজ্ঞান—এ সকল পশ্চিমি বিদ্যে শেখবার আবশ্যক নেই··· ? বিবাদ যদি কিছু থাকে সে তার বিদ্যার উপরে নয়—সে তার শেখানোর ভান করার ওপর।···এই···আসলে মতভেদের কারণ।···

'···পশ্চিমের সভ্যতার অহঙ্কার অভ্রভেদী।···সৌভাগ্য এবং সভ্যতার বোধ করি এদের এই একটি মাত্র মাপকাঠি—কে কত অল্প পরিশ্রমে ··বিজ্ঞানের সাহায্যে আগুণ দিয়ে, বিষ দিয়ে পুড়িয়ে গ্রামকে গ্রাম, শহরকে শহর ধ্বংস···করতে,···কত বেশি মানব হত্যা

করতে পারে। এদের কাছে বিজ্ঞানের এইটাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন।···তাই···আমাদের এবং আমাদের মতো আরও অনেক দুর্ভাগা জাতির কাঁধে যখনই ওরা চেপে থাকে তখনই ঘরে বাইরে এই কৈফিয়ৎ দেয় যে, এগুলো দেখতে শুনতে মানুষের মতো হলেও ঠিক মানুষ নয়।···এরা অসভ্য। অতএব আমরা গায়ে পড়ে এদের সভ্য করবার, মানুষ করবার ভার যখন নিয়েছি, তখন মানুষ এদের করতেই হবে। অতএব শিক্ষার জন্য এদের কঠোর শাস্তি দেওয়া একান্তই আবশ্যক।···এদের দেশে প্রচুর অন্ন, কিন্তু পাছে অবোধ শিশুর মতো বেশি খেয়ে পীড়িত হয়ে পড়ে তাই এদের মুখের গ্রাস নিজেদের দেশে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি—সে এদেরই ভালোর জন্যে। আবার টাকাকড়িগুলো পাছে অপব্যয় ক'রে নষ্ট ক'রে ফেলে তাই সে সমস্ত দয়া করে আমরাই খরচ করে দিচ্ছি ; সে-ও এদেরই মঙ্গলের নিমিত্ত।···কত কষ্ট করে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে··· আমাদের···মানুষ করতে···এসে···এম্‌নি সব ভালো করার কত কি অফুরন্ত কাহিনী ডেকে হেঁকে প্রচার করছেন···তাঁরা।···কিন্তু মানুষ আর···আমরা···হলাম না।···

'···একথা বোঝা কি এতই কঠিন যে, বিজ্ঞানের যে শিক্ষায় মানুষ যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠে, তার আত্মসম্মান জাগ্রত হয়ে দাঁড়ায়, সে উপলব্ধি করে সে-ও মানুষ, অতএব স্বদেশের দায়িত্ব শুধু তারই, আর কারও নয়,—পরাজিতের জন্য এম্‌নি শিক্ষার ব্যবস্থা বিজেতা কি কখনো করতে পারে ? তার বিদ্যালয়, তার শিক্ষার বিধি সে কি নিজের সর্বনাশের জন্যেই তৈরি করিয়ে দেবে ? সে কেবলমাত্র এইটুকুই দিতে পারে যাতে তার নিজের কাজগুলি সুশৃঙ্খলায় চলে। তার আদালতে বিচারের বহুমূল্য অভিনয় করতে উকিল, মোক্তার, মুন্সেফ, হুকুমমতো জেলে দিতে ডেপুটি, সব্‌-ডেপুটি, ধরে আনতে থানায় ছোট বড় পিয়াদা, ইস্কুলে ডুবালের পিতৃভক্তির গল্প পড়াতে

দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মাষ্টার, কলেজে ভারতের হীনতা ও বর্বরতার লেকচার দিতে নখদন্তহীন প্রফেসার, আফিসে খাতা লিখতে জীর্ণশীর্ণ কেরানী, —তার শিক্ষাবিধান এর বেশি দিতে পারে···না।···

'···কোনো বড় জিনিসই কখনো নিজের অতীতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে, নিজের শক্তির প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে হয় না···।···সৃষ্টি করাটা শক্তি, সেটা দেখা যায় না,—এমন কি পশ্চিমের দ্বারস্থ হয়েও না। এই শক্তির আধার নিজের প্রতি বিশ্বাস,—আত্মনির্ভরতা।···এই সত্যটা আজ আমাদের···বোঝবার দিন এসেচে···। ঠকিয়ে-মজিয়ে··· বা কেড়ে-বিকড়ে···নানা দেশ থেকে টেনে এনে জমা করাটাই দেশের সম্পদ নয়। যথার্থ সম্পদ দেশের প্রয়োজনের মধ্যে থেকেই গড়ে ওঠে।···পরের দেখে আমরাও যেন ওই ঐশ্বর্যের প্রতি লুব্ধ হয়ে না উঠি। আমাদের জ্ঞান, আমাদের অতীত আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছিল, আজ অপরের শিক্ষার মোহে যদি নিজের শিক্ষাকে হেয় মনে করে থাকি ত সে পরম দুর্ভাগ্য।···ঐ যে বড় বড় মানোয়ারী জাহাজ, ওই যে গোলা-গুলি-কামান-বন্দুক···ও সমস্তই ওদের সভ্যতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ···।···পশ্চিম ওদের সৃষ্টি করেচে নিজের গরজ থেকে। ···পশ্চিমের সভ্যতার একটা মস্ত মূলমন্ত্র হচ্ছে—ধনী হওয়ার। ওদের সামাজিক ব্যবস্থা, ওদের সভ্যতা, ওদের ধনবিজ্ঞান—এর সঙ্গে যার সামান্য পরিচয়ও আছে এ সত্য সে অস্বীকার করবে না। ···এরই জন্যে তার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত সাধনা নিয়োজিত।···এ ধনী হওয়ার অর্থ·· প্রতিবেশীকেও···ধনহীন করে তোলা···। নইলে, শুধু নিজে ধনী হওয়ার কোনো মানেই থাকে না! সুতরাং কোনো একটা সমস্ত মহাদেশ যদি কেবল ধনী হতেই চায় তো অন্যান্য দেশগুলোকে সে ঠিক সেই পরিমাণে দরিদ্র না করেই পারে না।···

'···ইউরোপ ও ভারতের শিক্ষার বিরোধ আসলে এইখানে,—এই মূলে।

'...বিদ্যা এবং বিদ্যালয় এক বস্তু নয়; শিক্ষা ও শিক্ষার প্রণালী এ দুটো আলাদা জিনিস। সুতরাং কোনো একটা ত্যাগ করাই অপরটা বর্জন করা নয়। এমনও হতে পারে...এদের...বিদ্যালয় ছাড়াই বিদ্যালাভের বড় পথ।...'

১৩২৮ সালে জুন মাসে দেশবন্ধু কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন। দেশবাসীর পক্ষ থেকে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে তাঁকে বিপুলভাবে অভিনন্দন দেওয়া হল। অভিনন্দনপত্রটি শরৎচন্দ্রেরই লেখা।

অভিনন্দনপত্রে লেখা ছিল :

শ্রদ্ধাস্পদ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের শ্রীকরকমলেষু—

হে বন্ধু, তোমার স্বদেশবাসী আমরা তোমাকে অভিবাদন করি। মুক্তিপথযাত্রী যত নরনারী যে যেখানে যত লাঞ্ছনা, যত দুঃখ যত নির্যাতন ভোগ করিয়াছে, হে প্রিয়, তোমার মধ্যে আজ আমরা তাহাদের সমস্ত মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া সগৌরবে, সবিনয়ে নমস্কার করি। সুজলা, সুফলা, শ্যামলা মা আমাদের আজ অবমানিতা, শৃঙ্খলিতা। মাতার শৃঙ্খলভার যত সন্তান তাঁহার স্বেচ্ছায় স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছে, তুমি তাহাদের অগ্রজ; হে বরেণ্য, তোমার সেই সকল খ্যাত ও অখ্যাত ভ্রাতা ও ভগিনীগণের উদ্দেশে স্বতঃ উচ্ছ্বসিত সমস্ত দেশের প্রীতি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি গ্রহণ কর।

একদিন দেশের লোক তোমাকে ক্ষুধিত ও পীড়িতের আশ্রয় বলিয়া জানিয়াছিল, সেদিন সে ভুল করে নাই। কিন্তু যে কথা তুমি নিজে চিরদিন গোপন করিয়াছ,—দাতা ও গ্রহীতার সেই নিভৃত করুণ সম্বন্ধ—আজও সে তেমনিই গোপনে শুধু তোমাদের জন্যই থাক্। কিন্তু, আর একদিন এই বাঙ্গলাদেশ তোমাকে ভাবুক বলিয়া, কবি বলিয়া বরণ করিয়াছিল, সেদিনও সে ভুল করে নাই। সেদিন এই

বাঙ্গলার নিগূঢ় মর্মস্থানটি উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখিতে, তাহার একান্ত সঞ্চিত অন্তর-বাণীটি নিরন্তর কান পাতিয়া শুনিতে, তাহাকে সমস্ত হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিয়া লইতে তোমার একাগ্র সাধনার অবধি ছিল না। তখন হয়ত তোমার সকল কথা বঙ্গের ঘরে ঘরে গিয়া পৌঁছায় নাই, হয়ত কাহারও রুদ্ধ দ্বারে ঘা খাইয়া সে ফিরিয়াছে, কিন্তু পথ যেখানে তাহার মুক্ত ছিল, সেখানে সে কিছুতেই ব্যর্থ হইতে পায় নাই।

তাহার পরে একদিন মাতার কঠিনতম আদেশ তোমার প্রতি পৌঁছিল। যেদিন দেশের কাছে স্বাধীনতার সত্যকার মূল্য নির্দেশ করিয়া দিতে সর্বস্ব পণে তোমাকে পথে বাহির হইতে হইল, সেদিন তুমি দ্বিধা কর নাই।

বীর তুমি, দাতা তুমি, কবি তুমি,—তোমার ভয় নাই, তোমার মোহ নাই,—তুমি নির্লোভ, তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন। রাজা তোমাকে বাঁধিতে পারে না, স্বার্থ তোমাকে ভুলাইতে পারে না, সংসার তোমার কাছে হার মানিয়াছে। বিশ্বের ভাগ্য-বিধাতা তাই তোমার কাছেই দেশের শ্রেষ্ঠ বলি গ্রহণ করিলেন, তোমাকেই সর্বলোক-চক্ষুর সাক্ষাতে দেশের স্বাধীনতার মূল্য সপ্রমাণ করিয়া দিতে হইল। যে কথা তুমি বার বার বলিয়াছ—স্বাধীনতার জন্য বুকের জ্বালা কি, তাহা তোমাকেই সকল সংশয়ের অতীত করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইল। বুঝাইয়া দিতে হইল,—'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'

এই তো তোমার ব্যথা! এই তো তোমার দান!

ছলনা তুমি জানো না, মিথ্যা তুমি বল না, নিজের তরে কোথাও কিছু লুকাইতে তুমি পার না—তাই, বাঙলা তোমাকে যখন 'বন্ধু' বলিয়া আলিঙ্গন করিল, তখন সে ভুল করিল না, তাহার নিঃসঙ্কোচ নির্ভরতায় কোথাও লেশমাত্র দাগ লাগিল না।

আপনার বলিয়া, স্বার্থ বলিয়া কিছু তোমার নাই, সমস্ত স্বদেশ, তাই তো আজ তোমার করতলে। তাই তো, তোমার ত্যাগ আজ

শুধু তোমার নয়, আমাদের। শুধু বাঙালীকে নয়, তোমার প্রায়শ্চিত্ত আজ বিহারী, পাঞ্জাবী, মারহাট্টি, গুজরাটী যে যেখানে আছে, সকলকে নিষ্পাপ করিয়াছে।

তোমার দান আমাদের জাতীয় সম্পত্তি,—এ ঐশ্বর্য বিশ্বের ভাণ্ডারে আজ সমস্ত মানব জাতির জন্য অক্ষয় হইয়া রহিল। এমনই করিয়াই মানব-জীবনের দেনা-পাওনার পরিশোধ হয়, এমনিই করিয়াই যুগে যুগে মানবাত্মা পশুশক্তি অতিক্রম করিয়া চলে।

একদিন নশ্বর দেহ তোমার পঞ্চভূতে মিলাইবে। কিন্তু যতদিন সংসারে অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের, সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের, অধীনতার বিরুদ্ধে মুক্তির বিরোধ শান্ত হইয়া না আসিবে, ততদিন অবমানিত, উপদ্রুত মানবজাতির সর্বদেশে, সর্বকালে,—অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমার এই সুকঠোর প্রতিবাদ মাথায় করিয়া বহিবে এবং কোনোমতে কেবল মাত্র বাঁচিয়া থাকাটা যে অনুক্ষণ শুধু বাঁচাকেই ধিক্কার দেওয়া, এ সত্য কোনোদিন বিস্মৃত হইতে পারিবে না।

জীবনতত্ত্বের এই অমোঘ বাণী স্বদেশে বিদেশে, দিকে-দিকে উদ্ভাসিত করিবার গুরুভার বিধাতা স্বহস্তে যাঁহাকে অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার কারাবসানের তুচ্ছতাকে উপলক্ষ সৃষ্টি করিয়া আমরা উল্লাস করিতে আসি নাই। হে চিত্তরঞ্জন, তুমি আমাদের ভাই, তুমি আমাদের সুহৃদ্, তুমি আমাদের প্রিয়,—অনেকদিন পরে তোমাকে কাছে পাইয়াছি। তোমার সকল গর্বের বড় গর্ব—বাঙালী তুমি; তাই তো সমস্ত বাঙলার হৃদয় তোমার কাছে আজ বহিয়া আনিয়াছে,—আর আনিয়াছি, বঙ্গজননীর একান্ত মনের আশীর্বাদ,—তুমি চিরজীবী হও! তুমি জয়যুক্ত হও!

তোমার গুণমুগ্ধ—স্বদেশবাসীগণ।

একদিন দেশবন্ধুর বাড়িতে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল রেঙ্গুনের বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকারের। কাউন্সিল প্রবেশের ব্যাপার নিয়ে দেশবন্ধু ও বাসন্তীদেবীর সঙ্গে শরৎচন্দ্র তখন আলোচনারত।

আলোচনা শেষ হলে গিরীনবাবুকে এতদিন পর দেখে শরৎচন্দ্র সোল্লাসে জড়িয়ে ধরলেন।

কথায়-কথায় প্রকাশ পেল গিরীনবাবুও বরাবরের মতো রেঙ্গুন ছেড়ে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। শুধু ফিরে আসেননি, খিদিরপুরে কংগ্রেসের কাজে যোগ দিয়েছেন।

দেশবন্ধুকে দিয়ে একটা কাজ করানোর দরকার ছিল গিরীনবাবুর। ব্যক্তিগত কাজ নয়, কংগ্রেস সংগঠনেরই কাজ। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠতা গিরীনবাবুর অজানা ছিল না। কাজেই শরৎচন্দ্রকে তিনি এ বিষয়ে মুরুব্বি পাকড়ালেন। শরৎচন্দ্র অবশ্য বন্ধুকৃত্যে একটুও নারাজ হলেন না।

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে এই সময়ে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত-১ম পর্ব' ইংরেজিতে অনুদিত হল। ভূমিকায় ইংরেজিতে শরৎচন্দ্রের একটি সংক্ষিপ্ত আত্মকথা লেখা ছিল। বইটির অনুবাদ করেছিলেন শ্রী কে. সি. সেন ও থিয়োডোসিয়া টমসন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে গয়া কংগ্রেসে শরৎচন্দ্রকে যেতে হল; একে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির তিনি সভ্য, তার ওপর সেবার কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করছেন দেশবন্ধু স্বয়ং। কিন্তু হঠাৎ স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় শরৎচন্দ্রকে কলকাতায় ফিরে আসতে হল।

বাঙলা কংগ্রেসে শরৎচন্দ্রের তখন অবিসম্বাদী প্রতিষ্ঠা। তাঁর হাতে বোনা সুতোয় তৈরি কাপড় মাথায় নিয়ে একবার এক মেলায় আনন্দে নৃত্য করেছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র।

বাংলার রাজনৈতিক আবহাওয়ায় তখন দলাদলির গুমট। দেশবন্ধুর অর্থবল ও জনবল দুটোই তখন হাতছাড়া। বিরুদ্ধ দল তাঁর গায়ে

সমানে কাদা ছুঁড়ছে। সমস্ত কাগজ তাদের দিকে। শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র উদ্বিগ্ন হয়ে ছোটাছুটি করছেন।

অথচ দেশবন্ধু অচঞ্চল। শরৎচন্দ্র অবাক হয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'সংসারের কোনো বিরুদ্ধ অবস্থাই কি আপনাকে দমাতে পারে না?'

দেশবন্ধু হেসে বললেন, 'তাহলে কি আর রক্ষে ছিল? পরাধীনতার যে আগুন এই বুকের মধ্যে অহোরাত্র জ্বলছে, তা তো আমাকেই পুড়িয়ে ফেলে দিত।'

টাকা যোগাড়ের জন্যে বড়লোকদের কাছে ধন্না না দিয়ে উপায় থাকত না। মাঝে-মাঝে একাজে শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র হতেন দেশ-বন্ধুর সঙ্গী

কোনো-কোনো ধনী ব্যক্তির ব্যবহারে শরৎচন্দ্র বিরক্ত হতেন। একবার শেয়ালদায় এক বড়লোকের বৈঠকখানায় অপেক্ষা করতে-করতে শরৎচন্দ্র অধৈর্য হয়ে উঠলেন।

বর্ষার ভিজে প্যাচপেচে রাত্তির। গৃহস্বামীর খোঁজ নেই। শরৎচন্দ্র অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, 'চলুন ফিরে যাই। গরজ কি একা আপনার? দেশের লোক যদি হাত মুঠো করে থাকে, আপনার কি ভূতে ধরেছে দেশোদ্ধার করার?'

দেশবন্ধু মৃদু হাসলেন, 'এ ঠিক নয়, শরৎবাবু। দোষ আসলে আমাদের। আমরা ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারি না। নইলে, বাঙালী আর যাই হোক কৃপণ নয়।'

গয়া কংগ্রেসের পর দেশবন্ধু 'স্বরাজ্য দল' গড়লেন। 'ফরোয়ার্ড' ও 'লিবার্টি' পত্রিকা প্রকাশ করে দেশবন্ধু তাঁর নির্ভীক মত প্রচার করতে লাগলেন।

তার কিছুদিন পর বরিশালে সম্মেলন আহূত হল।

দেশবন্ধু স্টীমারে বরিশাল চলেছেন। সঙ্গী শরৎচন্দ্র। আলো নিভিয়ে

ছুজনে কেবিনে শুয়েছেন। জানলা দিয়ে অন্ধকার আকাশে চোখে পড়ছে মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে ছু-একটি নক্ষত্র।

দেশবন্ধু ডাকলেন, 'শরৎবাবু, ঘুমিয়েছেন ?'

'না।'

'তবে চলুন ডেকে গিয়ে একটু বসি।'

ডেকের ওপর শেষ রাত্রের ঝিরঝিরে হাওয়া। পাশাপাশি ছুটো ডেকচেয়ারে ছুজনে বসলেন।

কথায়-কথায় দেশবন্ধু জিগগেস করলেন, 'আপনি চরকায় বিশ্বাস করেন ?'

'আপনি যে বিশ্বাসের কথা বলতে চাইছেন, সে বিশ্বাস সত্যিই আমার নেই।'

'কেন নেই ?'

'বোধ হয় অনেকদিন অনেক চরকা কেটেছি বলেই।'

'ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে পাঁচ কোটি লোকও যদি স্থতো কাটে, তাহলে ষাট কোটি টাকার স্থতো হতে পারে।'

'তা পারে। দশ লক্ষ লোক একসঙ্গে হাত লাগালে একদিনেই একটা বাড়ি তোলা যেতে পারে। কিন্তু মানুষগুলোকে এক করতে হবে। নমশূদ্র, মালো, নট, রাজবংশী, পোদ এদের সসম্মানে কোলে টেনে নিন, মেয়েদের ওপর অন্যায়, নিষ্ঠুর সামাজিক অবিচারের অবসান ঘটান—তাহলে আর লোকের অভাব হবে না।'

দেশবন্ধু আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'আপনারা দয়া করে আমাকে এই পলিটিক্সের বেড়াজাল থেকে উদ্ধার করে দিন, আমি ঐ ওদের মধ্যে গিয়ে থাকবো। আমি ঢের কাজ করতে পারব। বেচারাদের ধোপানাপিত নেই, ঘরামীরা ঘর ছেয়ে দেয় না। অথচ এরাই মুসলমান খৃষ্টান হয়ে গেলে আবার তারাই এসে এদের কাজ করে। এরকম সেন্সলেস্ সমাজ মরবে না তো মরবে কে ?'

২

হঠাৎ একদিন খবর এল হাওড়ার অ্যালায়েন্স্ ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে গেছে। শরৎচন্দ্রের যথাসর্বস্ব ছিল অ্যালায়েন্স্ ব্যাঙ্কে। তাছাড়া তাঁর কথা শুনে অনেকেই ঐ ব্যাঙ্কে তাদের টাকাকড়ি রেখেছিল।

শরৎচন্দ্রের মাথায় বজ্রাঘাত হল। সমস্যা শুধু তাঁর নিজের নয়, তাঁর ওপর নির্ভরশীল আত্মীয়-অনাত্মীয় বহু সংসার।

কাজেই প্রাণপণ করে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। ভেঙে পড়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তাঁর অনেক দায়িত্ব।

কিছুদিন বাদে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল শরৎচন্দ্রের 'দেনা পাওনা' উপন্যাস। পর-পর প্রকাশিত হল তিনখানি বই—'ছবি', 'গৃহদাহ' আর 'বামুনের মেয়ে'। অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিকায় তাঁর 'জাগরণ' উপন্যাসটি তখন 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হচ্ছিল। উপন্যাসটি অবশ্য সম্পূর্ণ হতে পারেনি। এদিকে আবার শিশির কুমার ভাদুড়ির তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো' গল্পটি ছায়াচিত্রে রূপায়িত হল।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্রকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে 'নববিধান' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল। শরৎচন্দ্র এই সময়ে নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের সহযোগিতায় 'রূপ ও রঙ্গ' নামে একটি সচিত্র সাপ্তাহিকের সম্পাদনা করেন।

আর্থিক অনটন অনেকাংশে মিটল।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ঢাকার মুন্সীগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করেন শরৎচন্দ্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

অধ্যাপক ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার ছিলেন উদ্যোক্তাদের মধ্যে।

এই সম্মেলনে 'আর্ট ও দুর্নীতি' শীর্ষক ভাষণে শরৎচন্দ্র বলেন :

—'আমি জানি, সাহিত্য-শাখার সভাপতি হবার যোগ্য আমি নই, ...তবুও যে এই পদ গ্রহণে সম্মত হয়েছিলাম, তার একটি মাত্র কারণ এই যে, নিজের অযোগ্যতা ও ভক্তিভাজনগণের মনঃপীড়া, এত বড় বড় দুটো ব্যাপারকে ছাপিয়েও তখন বারম্বার এই কথাটাই আমার মনে হয়েছিল যে, এই অপ্রত্যাশিত মনোনয়নের দ্বারা নবীনের দল আজ জয়যুক্ত হয়েছেন। তাঁদের সবুজ পতাকার আহ্বান আমাকে মানতেই হবে, ফল তার যা-ই কেন না হউক।...

'বঙ্গ সাহিত্যের অনেকগুলি বিভাগ,—দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস। সেই-সেই বিভাগীয় সভাপতিদের পাণ্ডিত্য অসাধারণ, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ এবং মার্জিত; তাঁদের কাছে আপনারা অনেক নব-নব রহস্যের সন্ধান পাবেন, কিন্তু আমি সামান্য একজন গল্পলেখক। গল্প লেখার সম্বন্ধেই দু-একটা কথা বলতে পারি...এ শুধু আমার নিতান্তই নিজের কথা। যে কথা সাহিত্য-সাধনার দশবৎসর কাল আমি নিঃসংশয়, অকুণ্ঠিতচিত্তে ধরে আছি।

'এই দশ বৎসরে...এর পাঠক সংখ্যা নিরন্তর বেড়ে চলেছে।... অভিযোগেরও অন্ত নেই যে, দেশের সাহিত্য দিনের পর দিন অধঃপথেই নেমে চলেছে ...কিন্তু দেশের সাহিত্য কি নবীন সাহিত্যিকের হাতে সত্য-সত্যই নিচের দিকে নেমে চলেছে ?...

'বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর চারিদিকের সাহিত্যিকমণ্ডলী একদিন বাঙলার সাহিত্যাকাশ উদ্ভাসিত করে রেখেছিলেন।...তাঁদের কাজ শেষ করে তাঁরা স্বর্গীয় হয়েছেন। তাঁদের প্রদর্শিত পথ, তাঁদের নির্দিষ্ট ধারার সঙ্গে নবীন সাহিত্যিকদের অনৈক্য ঘটেছে—ভাষা, ভাব ও আদর্শে। এমন কি, প্রায় সকল বিষয়েই। এইটেই অধঃপথ কিনা, এই কথাই আজ ভেবে দেখবার।

'আর্ট-এর জন্যই আর্ট, একথা আমি···আজও বলিনে।···এটা উপলব্ধির বস্তু, কবির অন্তরের ধন।

'সংজ্ঞা নির্দেশ করে অপরকে এর স্বরূপ বুঝান যায় না। কিন্তু সাহিত্যের আর একটা দিক আছে, সেটা বুদ্ধি ও বিচারের বস্তু। যুক্তি দিয়ে আর একজনকে তা বুঝানো যায়।···

'মানুষ তার সংস্কার ভাব নিয়েই তো মানুষ; এবং এই সংস্কার ও ভাব নিয়েই প্রধানতঃ নবীন সাহিত্যসেবীর সহিত প্রাচীনপন্থীর সংঘর্ষ বেধে গেছে। সংস্কার ভাবের বিরুদ্ধে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা যায় না, তাই নিন্দা ও কটুবাক্যের সূত্রপাতও হয়েছে এইখানে।··· বিধবা-বিবাহ মন্দ, হিন্দুর ইহা মজ্জাগত সংস্কার। গল্প বা উপন্যাসের মধ্যে বিধবা নায়িকার পুনর্বিবাহ দিয়া কোনো সাহিত্যিকেরই সাধ্য নাই, নিষ্ঠাবান হিন্দুর চক্ষে সৌন্দর্য সৃষ্টি করবার।···স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন গভর্ণমেন্টের সাহায্যে বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ করেছিলেন, তখন তিনি কেবল শাস্ত্রীয় বিচারই করেছিলেন, হিন্দুর মনের বিচার করেননি। তাই আইন পাশ হল বটে, কিন্তু হিন্দু সমাজ তাকে গ্রহণ করতে পারলে না।···তখনকার দিনে কোনো সাহিত্যসেবীই তাঁর পক্ষ অবলম্বন করলেন না।···সেদিনের সে ভাবধারা···সমাজদেহের স্তরে-স্তরে, গৃহস্থের অন্তঃপুরে সঞ্চারিত হতে পেলে না। কিন্তু এমন যদি না হত···আজ হয়তো আমরা হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থার আর একটা চেহারা দেখতে পেতাম। সেদিনের হিন্দুর চক্ষে যে সৌন্দর্য-সৃষ্টি কদর্য, নিষ্ঠুর ও মিথ্যা প্রতিভাত হত, আজ অর্ধশতাব্দী পরে তারই রূপে হয়তো আমাদের নয়ন ও মন মুগ্ধ হয়ে যেত। এমনই তো হয়, সাহিত্য-সাধনায় নবীন সাহিত্যিকের এই তো সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা।··আজকের লাঞ্ছনাটাই জীবনে তার একমাত্র এবং সবটুকু নয়, অনাগতের মধ্যে তারও দিন আছে।···সেদিনের ব্যাকুল, ব্যথিত নর-নারী শত লক্ষ

হাত বাড়িয়ে আজকের দেওয়া তার সমস্ত কালি মুছে দেবে।...শত কোটি বর্ষের প্রাচীন পৃথিবী আজও তেমনি বেগেই ধেয়ে চলেছে, মানব-মানবীর যাত্রা-পথের সীমা আজও তেম্‌নিই সুদূরে।...বিচিত্র ও নব নব অবস্থার মাঝ দিয়ে তাকে অহর্নিশই যেতে হবে—তার কতরকমের সুখ, কতরকমের আশা-আকাঙ্ক্ষা,—তার নিজের চলার উপরেই কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না? কোন সুদূর অতীতে তাকে সেই অধিকার হতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত করা হয়ে গেছে! যাঁরা বিগত, যাঁরা সুখদুঃখের বাহিরে, এ দুনিয়ার দেনা-পাওনা শোধ দিয়ে যাঁরা লোকান্তরে গেছেন, তাঁদের ইচ্ছা, তাঁদেরই চিন্তা, তাঁদের নির্দিষ্ট পথের সঙ্কেতই কি এত বড়? আর যাঁরা জীবিত, ব্যথায় বেদনায় হৃদয় যাঁদের জর্জরিত, তাঁদের আশা, তাঁদের কামনা কি কিছুই নয়? মৃতের ইচ্ছাই কি চিরদিন জীবিতের পথরোধ করে থাকবে? তরুণ-সাহিত্য তো শুধু এই কথাটাই বলতে চায়।...তারা না বললে বলবে কে? মানবের সুগভীর বাসনা, নর-নারীর একান্ত নিগূঢ় বেদনার বিবরণ সে প্রকাশ করবে না তো করবে কে?...

'আজ তাকে বিদ্রোহী মনে হতে পারে, প্রতিষ্ঠিত বিধি-ব্যবস্থার পাশে হয়তো তার রচনা আজ অদ্ভুত দেখাবে, কিন্তু সাহিত্য তো খবরের কাগজ নয়? বর্তমানের প্রাচীর তুলে দিয়ে তো তার চতুঃসীমানা সীমাবদ্ধ করা যায় না। গতি তার ভবিষ্যতের মাঝে। আজ যাকে চোখে দেখা যায় না, আজও যে এসে পৌঁছেনি, তারই কাছে তার পুরস্কার, তারই কাছে তার সম্বর্ধনার আসন পাতা আছে।

'আগেকার দিনে বাংলা সাহিত্যের বিরুদ্ধে আর যা নালিশই থাক, দুর্নীতির নালিশ ছিল না, ওটা বোধ করি তখনো খেয়াল হয়নি। এটা এসেছে হালে। তাঁরা বলেন, আধুনিক সাহিত্যের সবচেয়ে বড় অপরাধই এই যে, তার নর-নারীর প্রেমের বিবরণ অধিকাংশই দুর্নীতিমূলক, এবং প্রেমেরই ছড়াছড়ি।...তাই সতীত্বের মহিমা

প্রচারই হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ সাহিত্য। কিন্তু এই প্রপাগ্যাণ্ডা চালানোর কাজটাকেই নবীন সাহিত্যিক যদি তার সাহিত্যসাধনার সর্বপ্রধান কর্তব্য বলে গ্রহণ করতে না পেরে থাকে, তো তার কুৎসা করা চলে না···

'একনিষ্ঠ প্রেমের মর্যাদা নবীন সহিত্যিক বোঝে, এর প্রতি তার সম্মান ও শ্রদ্ধার অবধি নেই, কিন্তু সে সইতে যা পারে না, সে এর নাম করে ফাঁকি। তার মনে হয়, এই ফাঁকির ফাঁক দিয়েই ভবিষ্যৎ বংশধরেরা যে অসত্য তাদের আত্মায় সংক্রামিত করে নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, সেই তাদের সমস্ত জীবন ধরে ভীরু, কপট, নিষ্ঠুর ও মিথ্যাচারী করে তোলে। সুবিধা ও প্রয়োজনের অনুরোধে সংসারে অনেক মিথ্যাকেই হয়তো সত্য বলে চালাতে হয়, কিন্তু সেই অজুহাতে জাতির সাহিত্যকেও কলুষিত করে তোলার মতো পাপ অল্পই আছে।···

'পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়, এই কথাটা একদিন আমি বলেছিলাম।···সতীত্বের ধারণা চিরদিন এক নয়। পূর্বেও ছিল না, পরেও হয়তো একদিন থাকবে না।···একথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায়, তো এ-সত্য বেঁচে থাকবে কোথায় ?

'আনন্দ ও সৌন্দর্য কেবল বাহিরের বস্তুই নয়।। শুধু সৃষ্টি করবার ত্রুটিই আছে, তাকে গ্রহণ করবার অক্ষমতা নাই, একথা কোনোমতেই সত্য নয়।···আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে এ সত্য মনে রাখা প্রয়োজন।

'···পূর্বের মতো রাজারাজড়া জমিদারের দুঃখ-দৈন্য-দ্বন্দ্বহীন জীবনেতিহাস নিয়ে আধুনিক সাহিত্যসেবীর মন আর ভরে না!···এই অভিশপ্ত, অশেষ দুঃখের দেশে···যেদিন সে আরও সমাজের নিচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ, দুঃখ, বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্বসাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।···'

শরৎচন্দ্রের এই বক্তৃতা সেদিন শ্রোতাদের হৃদয় জয় করেছিল।

মুন্সীগঞ্জ থেকে শরৎচন্দ্র এলেন ঢাকায়। চারুবাবুর বাড়িতে। কদিন খুব আনন্দে কাটল।

ঢাকায় যতদিন ছিলেন শরৎচন্দ্রের মন পড়েছিল কলকাতায়। আদরের কুকুর ভেলু তখন বেলগাছিয়ার হাসপাতালে অসুস্থ। পথে-ঘাটে মরা জন্তু জানোয়ার দেখলেই বুকের মধ্যে তাঁর ছ্যাঁৎ করে উঠত।

ফেরবার সময় শরৎচন্দ্রের উদ্বেগের অন্ত ছিল না।

কিন্তু কলকাতায় ফিরেই হাসপাতালের চিঠি পড়ে শরৎচন্দ্র যখন জানলেন ভেলু ভালো আছে, তাঁর আনন্দের অবধি রইল না।

গাড়িতে করে ভেলুকে বাড়ি ফিরিয়ে আনলেন। কিন্তু এসেই ভেলু আবার অসুখে পড়ল।

ভেলুর শিয়রে বসে রাতের পর রাত জেগে কাটালেন শরৎচন্দ্র। ভেলুর রোগযন্ত্রণা উপশমের জন্যে জোর করে ওষুধ খাওয়াতে গিয়ে ভেলু তাঁর হাতে দাঁত ফুটিয়ে দিল।

পাগলা কুকুরের কামড়। বাড়ির সবাই শশব্যস্ত হয়ে ডাক্তার-বদ্যির জন্যে ছুটোছুটি জুড়ে দিল। শরৎচন্দ্র নির্বিকার। ব্যথা-পাওয়া হাতটা দিয়েই তিনি ভেলুর গলায় হাত বুলোতে লাগলেন।

মৃত্যুপথযাত্রী ভেলুর চোখ তার মনিবের মুখের দিকে ফেরানো। তার অনুতপ্ত চোখের কোলে জল।

ভোরবেলায় ভেলুর জীবনদীপ নিভে গেল।

ভেলুর কামড়েও শরৎচন্দ্র একটু উঃ-আঃ করেননি। কিন্তু ভেলুকে মারা যেতে দেখে তিনি এবার ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

দীর্ঘদিনের অষ্টপ্রহরের অবোলা সঙ্গীটিকে হারিয়ে শরৎচন্দ্রের মন ভেঙে গিয়েছিল।

ভেলুর স্মৃতিবিজড়িত হাওড়ার বাড়িতে আর তাঁর থাকা চলল না।

৩

সামতাবেড় গ্রাম। পানিত্রাস। কাছেই রূপনারায়ণ নদ। চারিদিকে ধূ-ধূ করছে সবুজ মাঠ। শান্ত সরল চাষীবাসী মানুষ।

বড়দিদি অনিলাদেবীর বাড়ি এই গ্রামেই। শরৎচন্দ্র এখানেই নিজের বাড়ি তৈরি করাচ্ছিলেন। সামতাবেড় আর শিবপুর প্রায়ই তাঁকে যাওয়া-আসা করতে হত।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন দেশবন্ধু দেহ রাখলেন।

এদিকে দুর্ভিক্ষের ধাক্কা সামতাবেড় গ্রামেও এসে লাগল। খরা লেগে খেতের ধান শুকিয়ে হলুদ হয়ে গেল। পুকুর-খাল শুকিয়ে কাঠফাটা। নদীতে জল নেই।

কী করা যায়? শরৎচন্দ্র ভারি ভাবনায় পড়লেন।

পেটে ভাত নেই লোকে খাটবে কেমন করে? খাটাবেই বা কে?

সাধ্যমতো কিছু টাকা-পয়সা দান-খয়রাত করা যায়। কিন্তু ভিক্ষে দেওয়াটা ওদের অপমান করা হবে।

শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্র এক মতলব বার করলেন। আচ্ছা, ধান-চাল টাকা-পয়সায় কতকটা দাদনের মতো ওদের দিলে হয় না? কোনো রকম লিখিত-পড়িত থাকবে না। শরীরটা যুৎ হলে পরে না হয় ওরা গতরে খেটে শোধ দেবে। পুকুর-কাটা, বাগান-রাস্তা তৈরি করা—আমার এখানেই ঢের কাজ আছে। মজুরী আগাম পাবে।

গাঁয়ের লোকেও এ প্রস্তাবে সায় দিল।

আস্তে-আস্তে এমনি করে শরৎচন্দ্রের বাগান-পুকুর-বাড়িঘর সম্পূর্ণ হল। দুঃস্থের দল দুহাত তুলে তাঁকে আশীর্বাদ জানাল।

সামতার এই মানুষগুলোর ওপর শরৎচন্দ্রের বরাবরই একটা টান

ছিল। পুজোর সময় একরাশ কাপড়জামা কিনে নিয়ে শিবপুর থেকে ফি বছরই তিনি দিদির বাড়িতে চলে যেতেন। সেখানে গ্রামের ছেলেমেয়েদের ডেকে সেগুলো তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। পুজোর সময় নতুন জামাকাপড় পেয়ে কী আনন্দই যে তারা করত।

ছোটভাই প্রকাশচন্দ্রের বিবাহ হয়ে গেছে। মেজভাই প্রভাসচন্দ্র সন্ন্যাসী। তাঁর নাম এখন স্বামী বেদানন্দ। বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ। স্বামী বেদানন্দ কলকাতায় এলেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে একবার অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে কিছুদিনের জন্যে শরৎচন্দ্রের বাড়িতেই এসে ওঠেন।

এই সময় শরৎচন্দ্রের শরীরও ভালো যাচ্ছিল না। আমাশয়, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, তার ওপর অত্যধিক পরিশ্রম। কবিরাজী চিকিৎসা চলছিল। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রয়োজন হল। কাজেই শরৎচন্দ্র সপরিবারে সামতাবেড়ের বাড়িতে এসে উঠলেন।

কিছুদিনের জন্যে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে গড়গড়া টানতে-টানতে শরৎচন্দ্র মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকেন রূপনারায়ণের দিকে। পড়ন্ত বেলায় অগুন্তি ডিঙি সার বেঁধে পাল তুলে চলে। মৃদুমন্দ হাওয়ায় বাগানের যুঁই-মল্লিকা-গোলাপের গন্ধ। অলসভাবে দু-একটা বই টেনে নিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পাতার পর পাতা ওল্টান। ডাকঘরের পিওন এসে চিঠি দিয়ে যায়। বাইরের জগৎটা এখানে শুধু চিঠির ভেতর দিয়েই কাছে আসে।

লোকের আসা-যাওয়ারও কামাই নেই। সুরেন মামা, উপীন মামা, কলকাতার বন্ধুবান্ধব। সম্পাদক ও তরুণ সাহিত্যিকের দল। সব দল বেঁধে হৈ-হৈ করে আসে। অতিথি আপ্যায়নে শরৎ-গৃহিনী অনলস।

আসেন 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদক জলধর সেন। এমন নিরভিমান

পরোপকারী মানুষ আর হয় না। জলধর দাদাকে শুধু হাতে ফেরানো দায়। দরকার হলে কয়েকদিন থেকে যান লেখা আদায়ের জন্যে।

ইতিমধ্যে শরৎচন্দ্রের 'হরিলক্ষ্মী' প্রকাশিত হয়েছে। অন্যান্য লেখারও তাগাদা আসছে।

'পথের দাবী' ধারাবাহিকভাবে বার হচ্ছিল 'বঙ্গবাণী'তে। সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ছেলেদের উদ্যোগে 'বঙ্গবাণী' প্রকাশিত হত। উমাপ্রসাদের উৎসাহেই শরৎচন্দ্র 'বঙ্গবাণী'তে লিখতেন।

এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স-এর সুধীরবাবু গোড়ার দিকে 'পথের দাবী' প্রকাশের ব্যাপারে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু পরে কোনো কারণে তিনি যখন পিছিয়ে গেলেন, রমাপ্রসাদ বাবুরাই তখন সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে 'পথের দাবী' প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন।

দেশজোড়া তখন বিক্ষোভের আগুন। কংগ্রেস বেআইনী। গুপ্ত সংগঠনে দেশ ছেয়ে গেছে। ছদ্মবেশে গা ঢাকা দিয়ে আছে অসংখ্য বিপ্লবী। তারা রাতের অন্ধকারে মাঝে-মাঝে সামতাবেড় গ্রামে এসে আশ্রয় নেয়। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রাত জেগে-জেগে সলা-পরামর্শ হয়।

শরৎচন্দ্র ঘরের মধ্যে অশান্ত মনে পায়চারি করছেন। রাত গভীর।

মনে পড়ছে 'পথের দাবী'র কথাগুলো : 'এদেশের মালিক যারা—তাদের কত জাহাজ, কত কলকারখানা, কত শত সহস্র ইমারত!··· অথচ এই বাংলার দশ লক্ষ নর-নারী প্রতিবৎসরে শুধু ম্যালেরিয়া জ্বরে মরে। এক-একটা যুদ্ধ জাহাজের দাম···? এর একটার খরচে কেবল দশ লক্ষ মায়ের চোখের জল চিরদিনের তরে মোছানো যায়।···শিল্প গেল, বাণিজ্য গেল, ধর্ম গেল,—নদীর বুক বুজে মরুভূমি হয়ে উঠছে, চাষা পেট পুরে খেতে পায় না, শিল্পী বিদেশীর দুয়ারে মজুরি করে—দেশে জল নেই, অন্ন নেই,···গোধন নেই—দুধের অভাবে শিশুরা শুকিয়ে

মরছে···দেশের মাটি দেশের সম্পদ থেকে দেশের ছেলেরা বঞ্চিত হয়েছে কোন অপরাধে··· ? একমাত্র শক্তিহীনতার অপরাধে।'···

হঠাৎ দরজায় টোকা পড়তেই চিন্তার সূত্র ছিন্ন হল। এত রাত্রে কে ডাকে ? জিগগেস করলেন, 'কে ?'

চাপা গলায় উত্তর এল, 'দরজাটা শিগগির খুলে দিন, শরৎদা।'

দরজা খুলতেই ভেতরে ঢুকলেন শরৎচন্দ্রের পরিচিত এক আত্মগোপনকারী বিপ্লবী।

'তুমি! কী সংবাদ, এই রাত্রে ?'

'খুব সাংঘাতিক খবর, শরৎদা। সরকার "পথের দাবী" বাজেয়াপ্ত করেছে। একটি কপিও বাজারে নেই। লুকিয়ে-চুরিয়ে কুড়ি-পঁচিশ টাকায় একেকখানা বই বিক্রি হচ্ছে।'

'বলো কী ?'

'হ্যাঁ, শরৎদা। পুলিশ বাড়ি-বাড়ি ঢুকে তল্লাসী করছে। যার কাছে বই পাচ্ছে তাকেই ধরছে। কিন্তু তবু বই পড়া বন্ধ করতে পারছে না।'

'তাহলে কিছু তো একটা করতে হয়, কী বলো ? সাহিত্যের ওপর এই আক্রমণ মুখ বুজে মেনে নিলে ওরা আরও পেয়ে বসবে। না, এর একটা বিহিত করা দরকার।'

'সে কাজ আপনাকেই করতে হবে, শরৎদা। তুমুলভাবে প্রতিবাদ করতে হবে এই অন্যায়ের।'

'প্রতিবাদ, হ্যাঁ প্রতিবাদ করতে হবে। নইলে আজ ওরা মুখ বন্ধ করবে, কাল টুঁটি টিপে মারবে।'

শরৎচন্দ্র অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন।

'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথকে প্রতিবাদ জানাবার জন্যে শরৎচন্দ্র অনুরোধ করে পাঠালেন।

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখলেন :

'কল্যাণীয়েষু—তোমার "পথের দাবী" পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক। অর্থাৎ ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে।...ইংরাজরাজ ক্ষমা করবেন এই জোরের উপরেই ইংরাজরাজকে আমরা নিন্দা করব সেটাতে পৌরুষ নেই। আমি নানা দেশ ঘুরে এলাম—আমার যা অভিজ্ঞতা হয়েচে তাতে এই দেখলেম—একমাত্র ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোনো গভর্ণমেণ্টই এতটা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে না।...শক্তিমানের দিক দিয়ে দেখলে তোমাকে কিছু না বলে তোমার বইকে চাপা দেওয়া প্রায় ক্ষমা।...শক্তিকে আঘাত করলে তার প্রতিঘাত সইবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে।...'

রবীন্দ্রনাথের চিঠি পড়ে শরৎচন্দ্র খুব বেদনাবোধ করলেন। রবীন্দ্রনাথের চিঠির একটি জবাব লিখলেন।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু বন্ধুদের পরামর্শে সে চিঠি আর রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠানো হয়নি। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সে চিঠিটা নিজের কাছে রেখে দেন।

শরৎচন্দ্র সেই চিঠিতে লিখেছিলেন :

'শ্রীচরণেষু—আপনার পত্র পেলাম। বেশ, তাই হোক।...

'আপনি লিখেছেন ইংরেজরাজের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। ওঠবারই কথা। কিন্তু এ যদি আমি অসত্য প্রচারের মধ্যে দিয়ে চেষ্টা করতাম লেখক হিসেবে তাতে আমার লজ্জা ও অপরাধ দুইই ছিল। কিন্তু জ্ঞানতঃ তা আমি করিনি।...আমি যখন লিখি এবং ছাপাই তার সমস্ত ফলাফল জেনেই করেছিলাম।...রাজপুরুষেরা আমাকেই ক্ষমা করে চলবেন এ দুরাশা আর ছিল না। আজও নেই।...কিন্তু বাঙলা দেশের গ্রন্থকার হিসেবে গ্রন্থের মধ্যে যদি মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে থাকি, এবং তৎসত্ত্বেও যদি রাজরোষে শাস্তি

ভোগ করতে হয় তো করতেই হবে—তা মুখ বুজেই করি বা অশ্রুপাত করেই করি, কিন্তু প্রতিবাদ করা কি প্রয়োজন নয়?...

'...রাজবন্দীরা জেলের মধ্যে দুধ ছানা মাখন পায় না বলে...চিঠি লিখে কাগজে-কাগজে রোদন করায় আমি লজ্জা বোধ করি, কিন্তু মোটা ভাতের বদলে যদি জেল অথরিটিরা ঘাসের ব্যবস্থা করে, তখন হয়তো তাদের লাঠির চোটে তা চিবোতে পারি, কিন্তু ঘাসের ড্যালা কণ্ঠরোধ না করা পর্যন্ত অন্যায় বলে প্রতিবাদ করাও আমি কর্তব্য মনে করি।

'কিন্তু বইখানা আমার একার লেখা, সুতরাং দায়িত্বও একার। যা বলা উচিত বলে মনে করি, তা বলতে পেরেছি কিনা এইটেই আসল কথা। নইলে ইংরাজ সরকারের ক্ষমাশীলতার প্রতি আমার কোনো নির্ভরতা ছিল না। আমার সমস্ত সাহিত্য সেবাটাই এই ধরণের। যা উচিত মনে করেছি তাই লিখে গেছি।

'...আমার প্রশ্ন ইংরাজ রাজশক্তির এ বই বাজেয়াপ্ত করবার জাস্টিফিকেশান যদি থাকে, পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে প্রোটেস্ট করার জাস্টিফিকেশানও তেমনি আছে।

'আমার প্রতি আপনি এই অবিচার করেছেন যে, আমি যেন শাস্তি এড়াবার ভয়েই প্রতিবাদের ঝড় তুলতে চেয়েছি এবং সেই ফাঁকে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করেচি। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। দেশের লোকে যদি প্রতিবাদ না করে আমাকে করতেই হবে। কিন্তু সে হৈ-চৈ করে নয়, আর একখানা বই লিখে।

'...আপনি যদি শুধু আমাকে এইটুকু আদেশ দিতেন যে এ বই প্রচারে দেশের সত্যকার মঙ্গল নেই, সেই আমার সান্ত্বনা হত। মানুষের ভুল হয়, আমারও ভুল হয়েছে মনে করতাম।

'আমি কোনোরূপ বিরুদ্ধভাব নিয়ে এ চিঠি আপনাকে লিখিনি, যা মনে এসেছে তাই অকপটে আপনাকে জানালাম।...আমি সত্যকার

রাস্তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি, তাই সমস্ত ছেড়ে-ছুড়ে নির্বাসনে বসে আছি। অর্থে সামর্থ্যে সময়ে কত যে গেছে সে কাউকে জানাবার নয়।···

'···আপনার অনেক ভক্তের মাঝে আমিও একজন, সুতরাং কথায় বা আচরণে আপনাকে লেশমাত্র ব্যথা দেবার কথা আমি ভাবতেও পারিনে।'

শরৎচন্দ্র বিছানায় শুয়ে। শরীরটা বেশ কিছুদিন ধরে খারাপ যাচ্ছিল। খাওয়া-দাওয়া প্রায় একরকম বন্ধ। সবচেয়ে মুশকিল কারো কথাই তিনি শোনেন না।

তারপর শুরু হল জ্বর। বিছানা ছেড়ে ওঠবার আর ক্ষমতা রইল না।

বাড়ির সকলেই খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল।

ডাক্তার এসে বললেন টাইফয়েড। ওষুধপত্রে কোনোই ফল হয় না।

খবর পেয়ে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছুটে এলেন।

হিরণ্ময়ী দেবীকে জিগগেস করলেন. 'কী ব্যাপার, বড়মা ?'

'আপনি এসেছেন মামা, ভালোই হল। কী ভাবনায় যে পড়েছি ওঁকে নিয়ে। আফিম ছাড়বার পর থেকেই ওঁর এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে।'

'আফিম ছেড়েছে শরৎ ? সে কী কথা ! কদ্দিন ?'

'তা প্রায় মাসখানেক হবে।'

'কী সর্বনাশ ! কিন্তু কেন ?'

'কী জানি। ওঁকেই গিয়ে জিগগেস করুন। আফিম ছাড়ার পরে দিন কতক নিজে হাতে যাঁতায় গম পেশা শুরু করেছিলেন।'

'বটে ! আচ্ছা, তুমি ভেতরে যাও বড়মা—আমি দেখছি।'

শরৎচন্দ্রের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন সুরেন্দ্রনাথ।

'কী হয়েছে, শরৎ ?'

গলার স্বর শুনে শরৎচন্দ্র তাকালেন।

'কে ? সুরেনমামা ? কখন এলে ?'

'এই আসছি। কিন্তু অসুস্থ শরীর নিয়ে তুমি এইভাবে মেঝেতে শুয়ে আছ কেন ? আর হঠাৎ আফিম ছাড়বার দুর্বুদ্ধিই বা তোমার হল কেন ?'

'জেলখানায় খেতে পাবো না বলে।'

'জেল ! তোমার আবার জেলে যাবার কী কারণ ঘটল ? কার কাছে কী এমন অপরাধ—'

অপরাধ আমার "পথের দাবী" বই লেখা। সরকার তো আর শুধু বই বাজেয়াপ্ত করেই রেহাই দেবে না। তাই—'

'তাই তুমি সাজা হবার আগেই নিজেকে সাজা দিচ্ছ, এই তো ?'

'নিজেকে তৈরি করছি।'

'তৈরি করতে-করতে নিজেকে যে এদিকে সেরে আনলে, সে খেয়াল আছে ?'

শরৎচন্দ্র কোনো জবাব দিতে পারলেন না। অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন।

ডাক্তারকে সব জানানো হল। ডাক্তার মাথা নেড়ে বললেন 'ওপিয়াম ফিভার।' পুরনো অভ্যেস হঠাৎ ছেড়ে দিলে এমনি হয়।

নতুনভাবে চিকিৎসা শুরু হল। ওষুধের সঙ্গে ক্রমে-ক্রমে আফিমের মাত্রাবৃদ্ধি। সেই সঙ্গে আফিমের সঙ্গে জল মিশিয়ে-মিশিয়ে আফিম ছাড়াবার প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গেল।

ডাক্তার শরৎচন্দ্রকে বোঝালেন, 'আপনাকে জেলে নিয়ে যাবার মতো বুকের পাটা ওদের নেই। দেশের লোক ক্ষেপে উঠবে না ! তাছাড়া আমি কথা দিচ্ছি, জেলে যদি আপনি যানও, জেলে আপনার আফিম পাবার আমি ব্যবস্থা করে দেব। এখন আপনি ওসব চিন্তা মাথা থেকে সরিয়ে ফেলুন।'

নতুন বিধানব্যবস্থায় কিছুদিনের মধ্যেই শরৎচন্দ্র রোগমুক্ত হলেন।

৪

সেরে উঠে আবার কাজ।

রূপনারায়ণের জল বাঁধ ভেঙে গ্রাম গ্রাস করতে চায়।

শরৎচন্দ্র দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন গ্রামরক্ষার কাজে। স্রোতের টানে কত নৌকো হাল-পাল ভেঙে তলিয়ে গেল। চারিদিকে আর্তের চীৎকার।

আর ঘরে-ঘরে রোগ। শোথ-আমাশয়-উদরাময়-ম্যালেরিয়া। হোমিও-প্যাথিক বাক্স হাতে শরৎচন্দ্র বাড়ি-বাড়ি ঘুরছেন। নিজের হাতেই রোগীকে তাপ-সেঁক-মালিশ করছেন। আহার-নিদ্রার সময় নেই।

ওদিকে চলেছে বাঁধ মজবুত করার মিলিত প্রচেষ্টা।

মেজভাই স্বামী বেদানন্দ হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে দাদার কাছেই এসে উঠলেন।

প্রাণপণ চেষ্টা করেও তাঁকে বাঁচানো গেল না। সামতার বাড়িতেই তাঁর নশ্বর দেহ সমাধিস্থ করা হল।

পত্রপুষ্পময় শান্ত নির্জন সেই সমাধিস্থানে রোজ সন্ধ্যায় শরৎচন্দ্র দীপ জ্বালান। বছরে-বছরে পালন করেন ভাইয়ের মৃত্যুতিথি। চলে অহোরাত্র নামকীর্তন ও দরিদ্রনারায়ণের সেবা।

১৩৩৩ সনের চৈত্র মাসে প্রকাশিত হল 'শ্রীকান্ত—তৃতীয় পর্ব'; ১৩৩৪ সনের শ্রাবণে 'ষোড়শী'। 'ষোড়শী' ছিল 'দেনাপাওনা'র নাট্যরূপ।

'ষোড়শী' অভিনয় করলেন শিশির-সম্প্রদায়। 'জীবানন্দ' শিশির

ভাদুড়ী এবং নাম-ভূমিকায় চারুশীলা দেবী। নাটক রচনাতেও শরৎচন্দ্রের যে পাকা হাত, তা প্রমাণ হয়ে গেল দর্শকদের সপ্রশংস করতালিতে। প্রথম রজনীতে শরৎচন্দ্র প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত ছিলেন।

বিদেশী ভাষায় 'শ্রীকান্ত' তর্জমা হওয়ায় বিদেশেও শরৎচন্দ্রের নাম ছড়িয়ে পড়ল। ইতালীয় অনুবাদে 'শ্রীকান্ত—প্রথম পর্ব' পাঠ করে রোমাঁ রোঁলাঁ শরৎচন্দ্রকে 'পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক' বলে অভিহিত করলেন।

পরের বছর প্রকাশিত হল 'পল্লীসমাজে'র নাট্যরূপ 'রমা'। 'শেষপ্রশ্ন' তখন ধারাবাহিকভাবে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হচ্ছে। 'অতি-আধুনিক-সাহিত্য কি রকম হওয়া উচিত তারই' আভাস তিনি এই উপন্যাসে দিতে চেয়েছিলেন। 'শেষের পরিচয়' উপন্যাসটিও তিনি এই সময় লিখতে শুরু করেন।

তাছাড়া ক্রমাগত সাত-আট বছর ধরে শহরে ও মফস্বলে বহু জায়গায় বহু বিষয়ে তাঁকে ভাষণ দিতে হয়েছে। প্রায় সমস্ত লিখিত ভাষণই পরে পত্র-পত্রিকায় ও প্রবন্ধগ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে।

১৯৩০-এর এপ্রিল।

সামতাবেড় থেকে হাওড়া স্টেশনে নেমে প্ল্যাটফর্ম ধরে এগোবার সময় দূর থেকে উত্তেজিত গোলমালের আওয়াজ ভেসে এল। শরৎচন্দ্র এদিক-ওদিক তাকিয়েও ব্যাপার কিছুই ঠাহর করতে পারলেন না।

হঠাৎ দেখলেন একজন পরিচিত লোক তাঁর দিকেই হনহন করে এগিয়ে আসছে।

'শরৎদা, আপনি ? আমি যে আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।'

'কেন বলো তো ? কী ব্যাপার ?'

'খুব গোলমাল চলেছে। গাড়োয়ানরা ধর্মঘট করেছে সি. এস. পি.

সি. এ-র কর্তাদের বিরুদ্ধে। সার্জেন্টদের সঙ্গে তাদের খুব একচোট মারপিট হয়ে গেছে। কেল্লা থেকে গোরাপল্টন এসে গুলি চালিয়েছে। শোনা যাচ্ছে, জন চারেক মারাও গেছে।…তা আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন ?'

'ঢাকায় যাবো বলে বেরিয়েছি।'

'কিন্তু আপনি তো এখানকার সি. এস. পি. সি. এ-র চেয়ারম্যান। আপনাকে সবাই খোঁজাখুঁজি করছে। খবরটা আপনাকে দেবার জন্যেই যাচ্ছিলাম।'

'না, তাহলে তো আর আমার এখন বাইরে যাওয়া চলবে না। চলো দেখি—'

৫

ধর্মঘট মিটল। শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ের গ্রামে ফিরে গেলেন।

সেখানেও এক নতুন অশান্তি মাথা তুলল।

স্থানীয় জমিদার মোহিনী ঘোষালের বিঘে কয়েক জলকর ছিল। এটা তাঁদের বহুকালের শিবোত্তরের দান। হরিপদ, নরু সর্দার, গৌর মাঝি এবং আরও কিছু দরিদ্র প্রজা সেই জলকর থেকে মাছ ধরে খেত, বিক্রিবাটা করে দিন গুজরান করত। জল সেচে নিয়ে চাষ আবাদ চালাত।

গ্রামের কেষ্ট বাগ জমিদারের কাছ থেকে জলকরটি পত্তন নিয়ে হঠাৎ একদিন ঘোষণা করে বসল, 'এ জলকর আমার। এই আটন বেড়ে দেলাম চতুঃসীমানায়—এর বাড়্ কেটে কেউ যদি একটি পা বেড়িয়ে দেয় ইপারে, তো রক্তলদী বইয়ে দোবো তখন।'

তার আস্ফালন শুনে প্রজার দল বেজায় ক্ষেপে গেল। উল্টে তারাও জানিয়ে দিল, 'জন্ম লিচি বঠে মাটির আড়ে, কিন্তুক কেঁচোর রক্ত নেই তো ঘাড়ে। রক্ত দেছে বাপ আর মা-জননীর তাপ। তবে আয়, ইবার তোর সঙ্গে এক হাত রক্ত আর আগুনের পরীক্ষে হয়ে যাক, কিষ্টো—'

দুদলেই সাজো-সাজো রব উঠল। দুদলের হাতেই ঢাল, সড়কী, পাকা লাঠি।

হুমকি দিয়ে তেড়ে এল কেষ্ট বাগের দল।

'খবর্দার। আর এক-পাও এগোবি না। আবার বলচি, এ জলকর আমার—'

'তোমার! বললেই হল? কক্ষনো না। আমাদের এতদিনের ভোগদখলী-করা জল—'

'এঁঃ, জল! ও জল তোদের নয়, তোদের এই বাবার জলকর। বুঝলি? এই দিলুম এবার কাটিয়ে—'

'খবর্দার! অনথ হয়ে যাবে। বাঁধ কাটিয়ে দিও না, বলচি'—

একসঙ্গে অনেকে চীৎকার করে ওঠে :

'বাপ তুলে গালাগাল দিবি না বলচি—

'আমরা খাবো কী—বাঁধটা কাইটে দেলে?'

নরু সর্দারের পেশীগুলো রাগে ফুলে উঠল। কাঁপতে-কাঁপতে বলল, 'উসব আমরা মানবোনি, কিষ্টো। ওই জলকরের মাছে মোদের সম্বচ্ছরের খাইখরচা চলে—'

কেষ্ট বাগ ভেংচি কেটে উঠে বলল, 'খরচা চলে—হেঁ! ওসব মাঙনা ব্যবসা এখন থেকে চলবে না, তা বলে দিচ্চি। খাজনা দিবি, বন্দোবস্ত লিবি—তবে এগোবি বাঁধের দিকে। জলকর আমি পত্তনী লিছি ঘোষালমশায়ের কাছ থেকে।'

'উসব আমরা বুঝি না, কিষ্টো। জল আমাদের তুই কেম্‌নে পত্তনী লিলি? মানবোনি উঁসব বাক্‌-তাড়স। খুনোখুনি হোক। আমরা যাবই।'

জলকরের দিকে প্রজার দল অগ্রসর হয়।

হুঙ্কার ছাড়ে কেষ্ট বাগ: 'খবর্দার সর্দার, খবর্দার মাঝি, আর এগিয়েছিস কি—'

প্রজার দল তবু থামল না দেখে এবার কেষ্ট বাগ তার দলবলকে হুকুম দেয়, 'এ-এ-এ চালাও তবে—'

বল্লম-চৌকি সড়কী-ঢাল দু তরফেই নেচে উঠল। তারপর এক আদিম বন্য হিংস্রতা সারা তল্লাট ছেয়ে ফেলল।

উলুবেড়ের কোর্টে মামলা। ফৌজদারি করেছে জমিদারপক্ষ। পত্তনীদার নাকি মার খেয়েছে সব চেয়ে বেশি।

শরৎচন্দ্র ভারি মুশকিলে পড়লেন। গোড়া থেকেই তিনি প্রজাদের দলে। তার ওপর তাঁর দিদির সেজো দেবর পাঁচকড়ি মুখুজ্যেকে মূল আসামীভুক্ত করা হয়েছে। অথচ একেই তাঁর এতদিকের এত ঝামেলা আর দায়িত্ব যে, মামলার টানা-হেঁচড়ায় তাঁর লেখাপড়া সাহিত্যচর্চা সমস্ত মাথায় উঠল।

ফৌজদারির সঙ্গে চলতে লাগল দেওয়ানি। স্বত্বস্বামিত্ব নিয়ে নানা-রকমের জটিল প্রশ্ন।

ওদিকে বাঙলার কংগ্রেসেও তখন খুব গোলমাল। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও সুভাষচন্দ্র বসুর মধ্যে নেতৃত্ব নিয়ে দলাদলি।

হাওড়া কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে শরৎচন্দ্রের পক্ষে এ ব্যাপারে চুপ করে থাকা সম্ভব হল না।

'শেষ প্রশ্ন' তখন সবে বেরিয়েছে। সুভাষচন্দ্রের বিশেষ অনুরোধে শরৎচন্দ্রকে কুমিল্লার রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে যেতে হল।

অবস্থাটা সে সময়ে কি রকমের ছিল, শরৎচন্দ্রের সে সময়কার লেখা ছুটো চিঠি থেকেই তা বোঝা যায়।

পণ্ডিচেরীতে দিলীপকুমার রায়কে তিনি লেখেন:

'কল্যাণীয়েষু,—মণ্টু, দেশোদ্ধার করবার জন্যে সুভাষের দল আমাকে বলপূর্বক কুমিল্লায় চালান করে দিয়েছিল। পথে একদল শেম্-শেম্ বললে, গাড়ীর জানালার ফাঁক দিয়ে কয়লার গুঁড়ো মাথায় গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে প্রীতিজ্ঞাপন করলে, আবার একদল বারো-ঘোড়ার-গাড়ী চাপিয়ে দেড় মাইল লম্বা শোভাযাত্রা করে জানিয়ে দিলে কয়লার গুঁড়োটা কিছুই নয়,—ও মায়া। যাই হোক রূপনারায়ণের তীরে আবার ফিরে এসেছি। "দি লিবারেটেড্ ম্যান হ্যাজ নো পারসোনাল হোপস্"—এ সত্য উপলব্ধি করতে আর আমার বাকি নেই। জয় হোক কয়লার গুঁড়োর। জয় হোক বারো-ঘোড়ার-গাড়ির!'

অন্য একটি চিঠিতে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি লেখেন :

'সুহৃদ্বরেষু,—কেদারবাবু, যথাসময়েই আপনার স্নেহশীতল চিঠিখানি পেয়েছিলাম, কিন্তু এ ক'দিন এমনি ব্যস্ত ছিলাম যে উত্তর দিতে পারিনি। কাল আমাদের হাবড়ার জেলা কংগ্রেস ইলেকশান হয়ে গেলো। এবার বিরুদ্ধ দলের সোরগোল, গালি-গালাজ ও লাঠি ঠক্‌ঠকি দেখে ভেবেছিলাম হয়তো বিনা রক্তপাতে শেষ হবে না। আমি প্রেসিডেন্ট, সুতরাং আমাদেরও যথারীতি প্রস্তুত হতে হয়েছিল। সভায় দাঙ্গা হয় এ আমার ভারি ভয়, তাই কাঁটা তারের বেড়া, মায় ইলেকট্রিফিকেশান সবই তৈরি রাখতে হয়েছিল। আর তৈরি ছিল বলেই দাঙ্গা হয়নি, নির্বিঘ্নে দখল কায়েম রাখা গেল। বছর দশেক প্রেসিডেন্ট আছি, ভেস্টেড ইণ্টারেস্ট জন্মে গেছে— সহজে ছাড়া চলে না। চলে কি? আমাদের পক্ষের যুক্তিটা এই যে গলদ যতই থাক, তোমরা বলবার কে? এবং দেশের মুক্তি যদি আসে তো আমাদের দ্বারাই আসুক। তোমরা পারবে না। তোমরা হাত দিতে যেয়োনা। কিন্তু ওরা সম্মত হয় না বলেই তো আমরা রেগে যাই। নইলে আমাদের, অর্থাৎ সুভাষী দলের মেজাজ খুবই ঠাণ্ডা। অনেকটা আপনার মতো।...কি বলেন?'

ওদিকে মামলার ব্যাপারটা তখন চরমে উঠেছে।

জমিদারপক্ষ ভেতরে-ভেতরে শান্তিভঙ্গের একটা ষড়যন্ত্র এঁটেছে।

ব্যাপারটা প্রজাদের কাছ থেকে জানতে পেরে শরৎচন্দ্র সটান পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আপিসে গিয়ে উপস্থিত হলেন। আর্জি পেশ করে বললেন, 'দেখুন, ঘটনাস্থলে একবার যাওয়া দরকার। কাল শান্তিভঙ্গ হবার আশঙ্কা আছে।'

'কেন? পুলিশ তো পাঠানো হয়েছে!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, পুলিশ আছে বটে, কিন্তু এমনভাবে আছে যাতে জমিদার পক্ষেরই সুবিধে হয়। শোনা যাচ্ছে, কাল ভোরে প্রজারা বাঁধের দিকে গেলে জমিদারের সশস্ত্র দলবল ঝাঁপিয়ে পড়বে। প্রজারা যাতে পড়ে-পড়ে শুধু মারই খায়, তা দেখবার জন্যে অবশ্যই পুলিশ হাজির থাকবে।'

'আপনার কথা—'

'হ্যাঁ, আমার কথা আপনি অভ্রান্ত বলে ধরে নিতে পারেন।'

'বটে ! আপনি কে ?'

'আমি ঐ গ্রামেরই একজন।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, ওখানে আমাদের লোক আছে।'

'লোক বলতে তো পুলিশ ?'

'আপনার বিশ্বাস রাখা দরকার তাদের ওপর।'

শরৎচন্দ্র চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন :

'বেশ, আপনি যখন রাজী নন, আমাকে উঠতে হচ্ছে। কিন্তু মনে রাখবেন এরপর যদি কিছু হয়, সমস্ত দায়িত্ব আপনার।'

'আপনার নাম ?'

'শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।'

পুলিশ সাহেব চোখ কপালে তুললেন। মুহূর্তে তাঁর মুখের ভাব বদলে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে বললেন, 'আপনি লেখক শরৎচন্দ্র ! দেখুন, আমি এখানে নতুন এসেছি। তাই আপনাকে দেখে চিনতে পারিনি। দয়া করে বসুন।'

শরৎচন্দ্র বসলেন। বসে বললেন, 'দেখুন, ম্যাজিস্ট্রেটের লেখা একটা অর্ডার আছে আমার কাছে। আপনাকে দেখাতে ভুলে গিয়েছিলাম।'

পুলিশ সাহেব সাগ্রহে বললেন, 'আপনি কিছু ভাববেন না। আমি নিজে যাবো আপনার সঙ্গে। এখানেই আপনি একটু বিশ্রাম করে নিন।'

সকালে জলকরের চারদিকে লোকে লোকারণ্য।

জমিদারের দলবল এসে জড়ো হয়েছে। একদল পুলিশ মজা দেখার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে।

ট্রেন থেকে নামলেন শরৎচন্দ্র। সঙ্গে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

পুলিশ সাহেবকে পেছনে ফেলে শরৎচন্দ্র হনহন করে এগিয়ে আসছেন। দেখে প্রজার দল এগিয়ে গেল। শরৎচন্দ্র তাদের বল-ভরসা। জমিদার-পত্তনীদারের দল সেদিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল। পুলিশগুলো একটু আড়ালে সরে গেল।

হঠাৎ একটা গুঞ্জন উঠল। পেছনে কে আসছে?

জমিদার পক্ষ পিছু হটতে লাগল। স্বয়ং পুলিশ সাহেব যে! পুলিশের ছত্রভঙ্গ দলটা হঠাৎ সার বেঁধে টান-টান হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তাদের চোখে-মুখে ত্রাস।

গলা শোনা গেল শরৎচন্দ্রের: 'কৃষকেরা তাদের জমি ছাড়বে না। কারণ, এ শুধু অন্নবস্ত্রের কথা নয়, তাদের সাতপুরুষের চাষ-আবাদের মাঠ, এর সঙ্গে তাদের নাড়ীর সম্পর্ক। এ তাদের দিতেই হবে।'

জনসভায় বক্তৃতা দেবার মতো কথাগুলো মাঠের মধ্যে গম-গম করতে লাগল।

পুলিশ সুপারিণ্টেডেণ্ট গট-গট করে এসে জলকরের সামনে দাঁড়ালেন।

৬

১৯৩১-এর শীতের সকাল।

বারান্দায় ইজিচেয়ারে বালাপোষ মুড়ি দিয়ে বসে আছেন শরৎচন্দ্র। হাতে গড়গড়ার নল। সামনে রূপনারায়ণের জলে ঝিকঝিক করছে কচি রোদ। পালতোলা নৌকোয় বসে দাঁড়ী-মাঝিরা গান গাইতে-গাইতে চলেছে। খানিক পরে হিরন্ময়ী দেবী পাশে এসে দাঁড়ালেন।

'এই যে এসো, বড়বৌ।'

'শরীরটা এখন কেমন লাগছে?'

'বেশ আছে। বেতো ঘোড়া, টেনে-টেনে যদ্দিন চলে—'

'ডাক্তারবাবুকে একবার—'

'না, না, থাক। ডাক্তারের এখন প্রয়োজন নেই। এদিকে এই, ওদিকে আবার আজ এটা কাল সেটা—আর যেন আমার ভালো লাগছে না, বড়বৌ।'

'কলকাতায় দিনকতক গিয়ে দেখালে···। ওখানকার বাড়িটাও তো শেষ হয়ে এল।'

দক্ষিণ কলকাতায় মনোহরপুকুরে অশ্বিনী দত্ত রোডে তখন শরৎচন্দ্রের নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছিল।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর হিরন্ময়ী দেবী বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন।

ভৃত্য ননী এসে চা দিল।

শরৎচন্দ্র জিগগেস করলেন, 'কলকাতার বাবুরা কোথায় রে? চা জলখাবার দিয়েছিস তো?'

'হ্যাঁ বাবু, খেয়ে-দেয়ে ওঁয়ারা সব নদীর দিকে বেড়াতে গেছেন।'

'আচ্ছা।'

কিছুক্ষণ বাদে নদী দেখে তাঁরা সব ফিরে এলেন।

'এসো, বসো সব, ভাই।'

'গ্রামটা ঘুরে দেখে এলাম। চমৎকার।'

'হ্যাঁ, তবে বাস করবার জ্বালাও কম নয়।'

'ও, সেই মামলাটার কথা বলছেন? তাতে তো আপনারাই জিতেছেন। আমাদের কী মনে হচ্ছে, জানেন?'

শরৎচন্দ্র হাসিমুখে তাঁদের দিকে তাকালেন।

'আমাদের মনে হচ্ছে "দেনাপাওনা" "ষোড়শী"র কথা। মনে হচ্ছে, আপনিই যেন সেই পরিবর্তিত অবস্থার দুর্দান্ত জমিদার জীবানন্দ।'

'তাই নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আপনার প্রজাদের তো রক্ষা করলেন, এখন আমাদেরও যে রক্ষা করতে হবে—'

'তোমাদের আবার কী হল?'

'ভারি সমস্যায় পড়েছি। টাউন হলে এবার আমরা রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা জানাবো।'

'এতো আনন্দের কথা। সমস্যার কী আছে?'

'মানপত্রটা আপনাকেই লিখে দিতে হবে। সভাপতিত্বও—'

'না, না, সে হয় না। দেশের জ্ঞানীগুণী কাউকে এ ভার—'

'আপনার আপত্তি আমরা কিছুতেই শুনব না।'

অমল হোমের ব্যবস্থাপনায় ১১ই পৌষ টাউন হলে রবীন্দ্রজয়ন্তী ও রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। শরৎচন্দ্রের লেখা মানপত্র পাঠ করা হল :

'কবিগুরু, তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।

'তোমার সপ্ততিতম-বর্ষশেষে একান্ত মনে প্রার্থনা করি জীবন-বিধাতা

তোমাকে শতায়ু দান করুন; আজিকার এই জয়ন্তী-উৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয় হউক।

'বাণীর দেউল আজি গগন স্পর্শ করিয়াছে। বঙ্গের কত কবি, কত শিল্পী, কত না সেবক ইহার নির্মাণকল্পে দ্রব্য সম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন, তাঁহাদের তপস্যা তোমার মধ্যে আজি সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তোমার পূর্ববর্তী সেই সকল সাহিত্যাচার্যগণকে তোমার অভিনন্দনের মাঝে অভিনন্দিত করি।

'আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা, কল্যাণ ও ঐশ্বর্য তোমার সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয়-চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে কৃত-কৃতার্থ হইয়াছি।

'হাত পাতিয়া জগতের কাছে আমরা নিয়াছি অনেক কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক।

'হে সার্বভৌম কবি, এই শুভদিনে তোমাকে শান্ত মনে নমস্কার করি। তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজি নতশিরে বারম্বার নমস্কার করি।'

টাউন হলের সেই সভায় শরৎচন্দ্র ছিলেন সভাপতি। তাঁর সুদীর্ঘ অভিভাষণ সেদিন যেমন মনোজ্ঞ হয়েছিল, তেমনি তা বহু নতুন চিন্তারও খোরাক জুগিয়েছিল।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে টাউন হলে আরেকটি সভা হল। জন্মদিন উপলক্ষে শরৎচন্দ্রের সম্বর্ধনা। সভাপতিত্ব করবার কথা ছিল রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু অনিবার্য কারণে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত হতে না পেরে তিনি আশীর্বাণী লিখে পাঠালেন।

আশীর্বাণীতে লেখা ছিল :

'কল্যাণীয়েষু—শরৎচন্দ্র,···তোমার সৃষ্টির ক্ষেত্র এখনো সম্মুখে দীর্ঘ প্রসারিত, তোমার জয়যাত্রার বিরাম হয়নি।···ফলশস্য-বহুল দূর ভবিষ্যৎ এখনো তোমাকে সম্মুখে আহ্বান করচে।

'···আকাশ থেকে শ্রাবণের মেঘ তার দান যখন নিঃশেষ করে দেয়, তখনি ধরাতলে প্রস্তুত হয় শরতের পুষ্পাঞ্জলি।

'···তুমি দেশকে প্রতিদিন নব নব রচনা-বিস্ময়ে নব নব আনন্দ দান করবে এবং সেই উল্লাসে দেশ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ তোমার জয়ধ্বনি করতে থাকবে। পথে পথে পদে পদে তুমি পাবে প্রীতি, তুমি পাবে সমাদর। পথের দুই পাশে যে সব নবীন ফুল ঋতুতে ঋতুতে ফুটে উঠবে তারা তোমার···। দেশের লোক তোমার পথের সঙ্গী, দিনে দিনে তারা তোমার কাছ থেকে পাথেয় দাবী করবে; তাদের সেই নিরন্তর প্রত্যাশা পূর্ণ করতে থাকো।···

'তোমার জন্মদিন উপলক্ষে 'কালের যাত্রা' নামক একটি নাটিকা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি।···

'কালের রথযাত্রার বাধা দূর করবার মহামন্ত্র তোমার প্রবল লেখনীর মুখে সার্থক হোক এই আশীর্বাদ সহ তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।'

প্রত্যুত্তরে শরৎচন্দ্র লিখলেন রবীন্দ্রনাথকে—'কালের যাত্রার সঙ্গে যে আশীর্বাদ আপনার পাইলাম সে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। আপনার তুচ্ছতম দানও জগতের যে কোনো সাহিত্যিকের সম্পদ, আমি এ দান মাথায় করিয়া লইলাম।'

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসাধনা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলল। সভা-সম্মেলনে তাঁর প্রদত্ত ভাষণ নানা পত্রিকায় মুদ্রিত হতে লাগল। ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হল 'স্বদেশ ও সাহিত্য', 'শ্রীকান্ত—চতুর্থ পর্ব', 'অনুরাধা-সতী ও পরেশ', 'বিরাজ বৌ' (নাটক), 'বিজয়া' প্রভৃতি গ্রন্থ। এর কিছুদিন পর 'বিপ্রদাস' উপন্যাসটিও প্রকাশিত হল।

শরৎচন্দ্র মনোহরপুকুরে অশ্বিনী দত্ত রোডে নিজের নবনির্মিত বাড়িতে উঠে এলেন।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ।

ভারতের ওপর চাপানো ইংরেজদের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে সারা দেশ তখন মুখর। ১৫ই জুলাই কলকাতা টাউন হলে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে যে বিরাট প্রতিবাদ সভা হল, শরৎচন্দ্র তাতে উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন। এই উপলক্ষে অ্যালবার্ট হলে পরবর্তী একটি সভায় শরৎচন্দ্র সভাপতিত্ব করলেন।

ঠিক ঐ সময়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে ডি-লিট উপাধি গ্রহণ করবার জন্যে সাদরে আমন্ত্রণ জানালেন। শরৎচন্দ্র সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-দানের অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন। এই উপলক্ষে ঢাকায় ছাত্র ও জনসাধারণের পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্রকে বিভিন্ন সভায় সম্বর্ধনা জানানো হয়। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ', 'মুসলমান সাহিত্য' শীর্ষক তাঁর এই সময়কার বক্তৃতাবলী 'বিচিত্রা' ও 'বাতায়ন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

অনুষ্ঠান-শেষে ষ্টীমারে অসুস্থ অবস্থায় ভাইস্-চ্যান্সেলর ডক্টর রহমানের তত্ত্বাবধানে শরৎচন্দ্র ঢাকা থেকে কলকাতায় ফিরে এলেন।

সেই বছরই 'রবিবাসরে'র উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের সুবিধানুযায়ী ২৫শে আশ্বিন শরৎচন্দ্রের ৬১-তম জন্মতিথি উপলক্ষে কলকাতায় শরৎজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হল।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সভায় উপস্থিত থেকে লিখিত আশীর্বাণী পাঠ করলেন:

'কল্যাণীয় শরৎচন্দ্র,—তোমার সাহিত্যরস-সত্রের নিমন্ত্রণ আজও রয়েছে উন্মুক্ত, অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ভরে উঠবে তোমার পরিবেশনপাত্র, তাই জয়ধ্বনি করতে এসেছে তোমার দেশের লোক তোমার দ্বারে।

'আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনের মূল্য এই যে, দেশের লোক কেবল যে তাঁর দানের মনোহারিতা ভোগ করেছে তা নয়, তার অক্ষয়তাও মেনে নিয়েছে।...যে লেখায় প্রাণ আছে প্রতিপক্ষতার দ্বারা তার যশের মূল্য বাড়িয়ে তোলে তার বাস্তবতার মূল্য। এই বিরোধের কাজটা যাদের তারা বিপরীত-পন্থার ভক্ত। রামের ভয়ঙ্কর ভক্ত যেমন রাবণ।

'জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান করে বের করেন নানা জগৎ—নানা রশ্মিসমবায়ে গড়া, নানা কক্ষপথে নানা বেগে আবর্তিত। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয়রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন বাঙালী যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে।...অন্য লেখকেরা অনেক প্রশংসা পেয়েছে, কিন্তু সর্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায়নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন, তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষাভাজন।

'আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনে বিশেষ গর্ব অনুভব করতে পারতুম যদি তাঁকে বলতে পারতুম তিনি একান্ত আমারি আবিষ্কার। কিন্তু তিনি কারো স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞানপত্রের জন্যে অপেক্ষা করেননি। আজ তাঁর অভিনন্দন বাঙলা দেশের ঘরে ঘরে স্বত-উচ্ছ্বসিত।...তিনি বাঙালীর বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পন্দ দিয়েছেন।

'সাহিত্যে উপদেষ্টার চেয়ে স্রষ্টার আসন অনেক উচ্চে। চিন্তাশক্তির বিতর্ক নয়, কল্পনাশক্তির পূর্ণ দৃষ্টিই সাহিত্যে শাশ্বত মর্যাদা পেয়ে থাকে। কবির আসন থেকে আমি বিশেষভাবে সেই স্রষ্টা সেই দ্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মাল্যদান করি।...'

পরের বছর ৬২ বছর বয়স পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে শরৎচন্দ্রের শেষ

জন্মতিথি পালিত হল। এই সময় তিনি বিভিন্ন অভিনন্দনের উত্তরে যেসব ভাষণ দিয়েছিলেন, শ্রোতাদের তা গভীরভাবে হৃদয় স্পর্শ করেছিল। তিনি বলেছিলেন :

'সমবেত শ্রদ্ধা-নিবেদনের এই যে আয়োজন, আমি জানি এ আমার ব্যক্তিকে নয়, কোনো বিত্তকে নয়, বিদ্যাকে নয়; এ শুধু আমাকে অবলম্বন করে সাহিত্য-লক্ষ্মীর পদতলে ভক্ত মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদন।...

'...আমার শক্তি কম, তবু নিজের দেশটিকে আমি বাস্তবিক ভালোবেসেছি—এর ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষ, এর জলবায়ু, এর দোষগুণ ত্রুটি দলাদলি সব কিছু আমি ভালোবেসেছি—এই আমার সারা জীবনের পাথেয়।...

'...সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলের কখনো হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনোদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই—এদেরই বেদনা দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার ...কত দেখেছি নির্বিচারের দুঃসহ সুবিচার।...বাকদেবীর অর্ঘ্য-সম্ভারে ঐ স্বল্প সঞ্চয়টুকু রেখে যাবার জন্যই আমার আজীবন সাধনা।...

'...এমনি করে জীবনের অপরাহ্ন সায়াহ্নে এগিয়ে এলো। এই ৩১শে ভাদ্র বছরে-বছরে ফিরে আসবে, কিন্তু, একদিন আমি আর আসবো না। সেদিন একথা কারো বা ব্যথার সঙ্গে মনে পড়বে, কারো বা নানা কাজের ভিড়ে স্মরণ হবে না।...

'...আজ তাই কৃতজ্ঞচিত্তে সকলকে স্মরণ করি।...আবার যদি ৩১শে ভাদ্র ফিরে আসে দেখা হবে, নইলে—বিদায়।'

৭

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ।

অসুখে-অসুখে শরৎচন্দ্রের শরীর ভেঙে পড়েছে। বাত-অর্শ-ম্যালেরিয়া-অজীর্ণ। প্রায় কোনো রোগই বাকি নেই।

কলকাতায় মাঝে-মাঝে এসে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে দেখিয়ে যান। কোথাও তাঁর এক নাগাড়ে বেশিদিন থাকতে ভালো লাগে না।

পড়াশুনো, লেখালেখি এক রকম বন্ধ। 'বিচিত্রা'য় 'আগামী কাল' ও 'ভারতবর্ষে' 'শেষের পরিচয়' উপন্যাস দুটি খানিকটা প্রকাশিত হবার পর অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে আছে। নরেন্দ্র দেবের 'পাঠশালা' ও অন্যান্য শিশু-সাময়িকীতে দু একটি কিশোর পাঠ্য গল্প প্রকাশিত হচ্ছে। পরে সেই সমস্ত গল্পের একটি সংকলন 'ছেলেবেলার গল্প' নামে প্রকাশিত হয়।

শরীর ক্রমেই নেতিয়ে আসছে। শরৎচন্দ্রের মনে আর সে রকম জোরও নেই। সামতাবেড়ের গ্রামের বাড়িতে একদিন তিনি সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে বললেন, 'এবার বুঝি তোমাদের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিতে হয়, সুরেনমামা।'

'কী যে বলো, অসুখ কি আর মানুষের হয় না ?'

'হয়। তবে মনে হচ্ছে, এবার বোধহয় আমায় কালে ধরেছে। আমি আর বাঁচব না, সুরেন।'

'এটা তো ঠিক তোমার মতো মানুষের কথা হল না ? কত শক্ত, কত দৃঢ় ছিল তোমার মন। তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র, এখন দেখছি ফলিত জ্যোতিষে গিয়ে ঠেকেছ। কোথায় গেল তোমার সেই চিরদিনের দুর্জয় সাহস ?'

'ভুগে-ভুগে খুঁটি আমার আলগা হয়ে গেছে যে—'

ম্লান হেসে শরৎচন্দ্র বলে চললেন, 'তাছাড়া ব্যাধিগ্রস্ত পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকতে তো কেউ চায় না, সুরেন—বিশেষ করে সাহিত্যিকরা। শরীর আমার বরাবরের মতোই ভেঙেছে। এখন বাঁচা শুধু বিড়ম্বনা।'

শূন্য দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র চেয়ে রইলেন।

প্রাণপণে চোখের জল রুদ্ধ করে সুরেন্দ্রনাথ বললেন, 'শরৎ, অন্তত দিন কয়েকের জন্যে তুমি কলকাতায় চলো। খানিকটা হাওয়া বদল করলে মন আপনিই ঠিক হয়ে যাবে।'

'গ্রাম ছেড়ে যেতে মন চাইছে না যে। বাড়ি ফেলে—'

'বারে, সেখানেও তো তোমার বাড়ি। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা-শুনোও হবে। তাছাড়া, এক্স-রে করিয়ে জানা দরকার রোগটা কী।'

'রোগ জানবে আর কী। বিধানবাবু দেখে হয়তো বলবেন—ম্যালেরিয়া। না হয়, টাইফয়েড। কিন্তু তার মানে ডাক্তারদের হাতের মধ্যে গিয়ে পড়া।'

'তোমার সবই অদ্ভুত! রোগ হলে ডাক্তারের হেফাজতে থাকতে হবে না? বিধানবাবুকে আগে তো দেখাও—'

'তাঁকে যে আমি চিনি, সুরেন। এক নজর দেখেই রোগ ধরে ফেলবেন। হয়তো সাঙ্ঘাতিক একটা রোগ—'

'আগে থেকে তুমিই বা অত ভাবছ কেন? সাঙ্ঘাতিক কিছু হলে তার চিকিৎসাও তো আছে। ধন্বন্তরীর হাতে সে ভার না হয় তখন ছেড়ে দিও।'

চোখ দুটো বন্ধ করে শরৎচন্দ্র কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন।

কয়েকদিন টালবাহানার পর শেষ পর্যন্ত কলকাতায় যাওয়া সাব্যস্ত হল।

দুয়োরে পালকি এসে দাঁড়াল।

হিরণ্ময়ী দেবী সঙ্গে যেতে চাইলেন। শরৎচন্দ্র তাঁকে অনেক করে বোঝালেন।

'ভয় কী? মামা রইলেন সঙ্গে। কদিনই বা? যাব আর দেখিয়েই চলে আসব। পৌঁছেই টেলিগ্রাম করব। তুমি ভেবো না। এখানে তো খোকা রইল, দেখাশুনা করবে তোমাদের।'

ছোট ভাই প্রকাশচন্দ্রেরই আদরের নাম খোকা। প্রকাশচন্দ্র ছল ছল চোখে সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'এই তো খোকা, ভয় কী? চুপ করো এখন সব। যাওয়ার সময় চোখের জল ফেলতে নেই, বড়বৌ। তাহলে আর যেতেই পারব না।'

হিরণ্ময়ী দেবী তাড়াতাড়ি চোখ মুছলেন। শরৎচন্দ্র এগিয়ে গেলেন গোবিন্দজীকে প্রণাম করতে। দেশবন্ধুর সেই গোবিন্দজী। গলায় কণ্ঠি পরে শরৎচন্দ্র স্বহস্তে এঁর সেবা করেছেন এই সেদিনও।

পালকির পাশে দাঁড়িয়েছে সকলে। গ্রামের লোক ভিড় করে এসেছে। সকলেরই চোখ-মুখে দুশ্চিন্তার ম্লান ছায়া।

শরৎচন্দ্রের শুকনো পাণ্ডুর মুখ। অবিন্যস্ত শাদা চুল গুচ্ছ-গুচ্ছ কপালে এসে পড়েছে। পায়ে দামী কাজ-করা মোজা, বার্ণিশ-করা জুতো। এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে তারপর তাড়াতাড়ি পালকিতে উঠে বসলেন।

গ্রামের রাস্তা দিয়ে দুলে-দুলে পালকি চলেছে। বেহারাদের গানের তালে-তালে মানুষজন নিয়ে পথপ্রান্তর পিছিয়ে যাচ্ছে।

শরৎচন্দ্র অনুভব করতে লাগলেন জীবন যেন অনন্ত যাত্রায় চলেছে।

৮

অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়ি। শরৎচন্দ্র ইজিচেয়ারে শুয়ে।

তাঁর অসুস্থতার খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। চেনা-অচেনা, আত্মীয়-বন্ধু-ভক্তের দল মুহুর্মুহু খবর নিতে আসছে। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ও ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায় নিয়েছেন তাঁর চিকিৎসার ভার।

শরৎচন্দ্র কখনো আশা অনুভব করেন, কখনো ম্রিয়মান হন। এত লোকের এত ভালোবাসা তাঁর অন্তর স্পর্শ করে। এই তো জগৎ, এই তো মানুষ, এই তো জীবন!

একদিন উপেন্দ্রনাথকে ডেকে বললেন, 'উপীন, তুমি একবার সেই গানটা শোনাবে?'

'কোনটা, শরৎ?'

'সেই যে রবিবাসরের সম্বর্ধনা-সভায় গেয়েছিলে? তোমার গলায় বড় মিষ্টি লাগে।'

উপেন্দ্রনাথ গাইলেন:

নন্দিত তুমি শরৎচন্দ্র,
বন্দিত তুমি হে রূপকার···

শরৎচন্দ্রের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল।

ডাক্তার বিধান রায় পরীক্ষা করলেন। দুরারোগ্য অন্ত্রের ব্যাধি। এক্স-রে করা হল। যকৃত পচে গেছে। অস্ত্রোপচার দরকার।

ছুটোছুটি পড়ে গেল। ভয়। চিন্তা। উদ্বেগ।

খবর পেয়ে প্রকাশচন্দ্র সামতাবেড় থেকে হিরণ্ময়ী দেবীকে সঙ্গে করে চলে এসেছেন।

একটি ইউরোপীয় নার্সিং হোমে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা হল। কিন্তু জায়গাটা শরৎচন্দ্রের পছন্দ হল না। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার সুশীল চ্যাটার্জীর 'পার্ক নার্সিং হোমে' শরৎচন্দ্রকে স্থানান্তরিত করা হল।

ডাক্তার ললিত বাঁড়ুজ্যেকে দিয়ে অস্ত্রোপচার করার কথা বললেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়।

'কিন্তু ললিতবাবু তো বারো-তেরোশো টাকার কমে—'

বিধানবাবু বললেন, 'সে ভার আমার। চারশো টাকায় তাঁকে···'

অস্ত্রোপচারে শরৎচন্দ্রের সম্মতি পাওয়া গেল। দুর্বলতার দরুন শরীরে রক্ত দেবার দরকার হল। প্রকাশচন্দ্র নিজের শরীর থেকে দিলেন।

অপারেশন থিয়েটারে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ও ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায় দুজনেই উপস্থিত। ললিতবাবু অপারেশন করলেন।

অস্ত্রোপচার-পর্ব ভালোভাবেই সমাধা হল। সকলেই খুব খুশিই। কারণ, টেবিলে শায়িত অবস্থাতেই প্রাণহানির আশঙ্কা ছিল।

কড়া নির্দেশ দেওয়া হল, শরৎচন্দ্রকে যেন মুখ দিয়ে কিছু খাওয়ানো না হয়। বমির দমকে পেটের সেলাই ছিঁড়ে গেলে কিছুতেই তখন আর রোগীকে প্রাণে বাঁচানো যাবে না।

১৬ই জানুয়ারী ১৯৩৮। ২রা মাঘ ১৩৪৪।

হেঁচকি উঠছে শরৎচন্দ্রের।

চারপাশে যে যেখানে ছিল সবাই ছুটে এল। কী সর্বনাশ! মুখ দিয়ে কিছু খেয়েছিলেন নিশ্চয়।

দমকে-দমকে হেঁচকি উঠছে। হাতটা একটু নড়ে উঠল। তারপর সমস্ত শরীর নিশ্চল নিস্পন্দ হয়ে গেল।

বাইরে অপেক্ষমান জনতা শরৎচন্দ্রের কুশল জানতে চাইছে। 'রয়টার' আর 'বেতার কেন্দ্র' মুহুর্মুহু টেলিফোন করছে। হঠাৎ ভেতর থেকে কাতর কান্নার আওয়াজ ভেসে এল।

উদ্বিগ্ন জনতার চোখেও জলের ধারা নামল।

খবরটা রবীন্দ্রনাথের কানে যেতেই শরৎচন্দ্রের বিয়োগ বেদনা প্রকাশ পেল তাঁর শোকাকুল শ্লোকে :

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি'
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি'॥

॥ **সমাপ্ত** ॥

শরৎ জীবনপঞ্জী

প্রথম অধ্যায়

১৮৭৬ ১৫ই সেপ্টেম্বর। ৩১শে ভাদ্র ১২৮৩। দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের জন্ম। পিতা—মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। মাতা—ভুবনমোহিনী দেবী।

১৮৭৭ দেবানন্দপুরে বাল্যজীবন। প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালায়

১৮৮৫ পড়াশুনা। ডাকনাম—ন্যাড়া।

১৮৮৬ পিতামাতার সঙ্গে স্বল্পদিন ডিহরী-অন্-শোনে অবস্থান, তারপর ভাগলপুরে মাতুলালয়ে আগমন।

অক্ষয় পণ্ডিতের হেফাজতে দুর্গাচরণ বালক বিদ্যালয়ে ছাত্রবৃত্তি ক্লাশে লেখাপড়া। কৈশোরের শাসন-বারণ তুচ্ছ করার খেলা।

১৮৮৭ ভাগলপুর। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাশ। টি. এন. জুবিলী কলিজিয়েট স্কুলে ভর্তি। রাজেন্দ্র মজুমদার বা রাজুর সঙ্গে পরিচয়। ঘনিষ্ঠতা। রাজুর সান্নিধ্যে দুঃসাহসী জীবনের চর্চা। বন্ধনহীন জীবনের আস্বাদ।

১৮৮৮ ইংরেজী স্কুলে প্রথম বর্ষের পরীক্ষায় ডবল প্রমোশন। সঙ্গীদের নিয়ে নেপথ্যে সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১৮৯১ দেবানন্দপুরে দ্বিতীয়বার আগমন।

১৮৯২ হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন।

১৮৯৩ অল্পস্বল্প সাহিত্যচর্চা।

১৮৯৪ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম। সমাজের বিভিন্ন মানুষ ও বিচিত্র জীবনের সঙ্গে মেলামেশা। হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়ার সময় অকস্মাৎ পড়া বন্ধ। নিরুদ্দেশ ও যাযাবরজীবন যাপন। বছরের শেষ দিকে প্রথমে কলকাতা পরে ভাগলপুরে প্রত্যাবর্তন। আবার টি. এন. জুবিলী স্কুলে ভর্তি। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় যোগদান ও দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ। সাহিত্য-সভার নেতৃত্ব। স্বাদেশিকতার উন্মেষ। মজঃফরপুরের প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব।

১৮৯৫ টি. এন. জুবিলী কলেজে এফ. এ. ক্লাশে ভর্তি। রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র কুমার সতীশচন্দ্রের 'আদমপুর ক্লাব' প্রতিষ্ঠা। রাজেন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের ক্লাবে যোগদান। সতীশচন্দ্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা। ঘোর সামাজিক দলাদলিতে ঘটনাচক্রে অংশ গ্রহণ। মায়ের মৃত্যু। কলেজের পড়াশুনায় ইস্তফা।

তৃতীয় অধ্যায়

১৮৯৬ মাতুলালয় ত্যাগের পর পিতার সঙ্গে খঞ্জরপুর মহল্লায় বসবাস। দেনার দায়ে দেবানন্দপুরের গৃহ হস্তান্তর।

১৮৯৭ খেলাধুলা। শিকার। রাজবানলী এস্টেটে গোড্ডায় রাজা শিবশঙ্কর সাহুর কাছে কিছুকাল চাকুরী। গান-বাজনা-থিয়েটারের নেশা। আদমপুর ক্লাবের নাট্যবিভাগের সুনাম অর্জনে সাহায্য। রাজেন্দ্র নিরুদ্দেশ।

১৮৯৯ নিদারুণ মানসিক বিপর্যয়ে ভাসমান। প্রতিবেশী বিভূতিভূষণ

১৯০২ ভট্ট—ডাকনাম পুঁটু—ভট্ট-গৃহে অবিরাম গ্রন্থপাঠ, সাহিত্য-

চর্চা। সাহিত্যের আসরে রচনা পাঠ। বিভূতিবাবুর ভগ্নী নিরুপমা দেবীর—ডাকনাম বুড়ি—আসরে যোগদান। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয়। হাতে লেখা মাসিকপত্র 'ছায়া'-র আত্মপ্রকাশ। 'পাষাণ', 'বোঝা', 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনাথ', 'কাশীনাথ' প্রভৃতি গল্পরচনা।

পিতার সঙ্গে মনান্তর। অভিমানে নিরুদ্দেশ। সন্ন্যাসীর বেশে নানা স্থানে ভ্রমণ। বিভিন্ন সন্ন্যাসাশ্রমে অবস্থানের পর মজঃফরপুরের ধর্মশালায় আগমন। লেখিকা অনুরূপা দেবীর স্বামী শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আতিথ্য গ্রহণ।

রাজা মহাদেব সাহুর সঙ্গে পরিচয়। ঘনিষ্ঠতা। সাহুগৃহে অবস্থান। শিকারে যোগদান। জলসায় গান-বাজনায় সুখ্যাতি অর্জন।

পিতার মৃত্যুসংবাদে খঞ্জরপুরে প্রত্যাবর্তন। শ্রাদ্ধাদি-শেষে কলকাতায় ভবানীপুর অঞ্চলে 'বোম-মামা' লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাসাবাড়িতে আগমন।

১৯০৩ জানুয়ারি মাসে সকলের অজ্ঞাতসারে একদিন ভাগ্যান্বেষণে বর্মা-যাত্রা। রেঙ্গুন শহরে মেসোমশায় উকীল অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে কিছুদিন অবস্থান।

বর্মা-যাত্রার পূর্বে অন্যতম মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেনামে 'মন্দির' গল্প 'কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতা'র জন্য প্রেরণ। প্রতিযোগিতা-জয়ী গল্পটি 'কুন্তলীন পুরস্কার ১৩০৯ সন' গ্রন্থে প্রকাশ।

ভূপর্যটক গিরীন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে পরিচয় ও প্রগাঢ়

১৯০৪ উত্তর বর্মার জটিল অলিগলিতে বৌদ্ধভিক্ষুর বেশে পরিক্রমা।

১৯০৫ বিচিত্র বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে পরিচয়। পেগুতে প্রায়

ছয়মাসের মতো চাকুরী। মেসোমশায়ের মৃত্যু। রেঙ্গুন প্রত্যাবর্তন।

কবি নবীন সেনের সম্বর্ধনা সভায় গান। শরৎচন্দ্রকে কবির 'রেঙ্গুন-রত্ন' উপাধি দান।

মণি মিত্রের চেষ্টায় ডি. এ. জি.-র অফিসে কেরানীগিরি। লোয়ার পোজনডং বাঙালী মিস্ত্রীপল্লীতে দোতলা এক কাঠের বাড়িতে অবস্থান। চট্টরাজের হোটেলে আহারের ব্যবস্থা। গিরীন সরকার এই পল্লীর নামকরণ করেন—'শরৎপল্লী'।

১৯০৬
১৯০৭ চিত্রাঙ্কনে গভীর মনোনিবেশ। যোগেন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব। 'নারদমুনি', 'রাবণ-মন্দোদরী', 'মহাশ্বেতা' প্রভৃতি চিত্রাঙ্কনে শরৎচন্দ্রের শিল্পী হিসাবে আত্মপ্রকাশ।

রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষের সঙ্গে ধর্ম-দর্শন আলোচনা।

'ভারতী' পত্রিকায় 'বড়দিদি' রচনা প্রকাশ। বহুকাল বাদে সাহিত্যরচনায় অনুশীলন।

১৯০৮
১৯১২ লব্ধপ্রতিষ্ঠ এ্যাডভোকেট কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ও রায়সাহেব নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয়। গায়ত্রী, কামিনী প্রভৃতি সমাজচ্যুতা হতভাগিনীদের বন্ধন-ক্রন্দনের অভিজ্ঞতা। বস্তিবাসী সম্পর্কে সুগভীর তথ্যসন্ধান।

'নারীর ইতিহাস' ও 'চরিত্রহীন' রচনা।

শান্তি দেবীর সঙ্গে বিবাহ।

পোজনডং অঞ্চলে প্লেগের মহামারি। প্লেগে শান্তি দেবীর মৃত্যু। অগ্নিকাণ্ডে যথাসর্বস্ব ভস্মীভূত।

১৯১২
১৯১৩ অল্পদিনের জন্য কলকাতা আগমন। হাওড়ায় খুরুট রোডে সাময়িকভাবে অবস্থান। 'যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালের সঙ্গে পরিচয়। অন্যতম মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় 'যমুনায়' লেখা দিতে স্বীকৃত।

হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে বিবাহ।

'যমুনা'য় পরিণত বয়সের প্রথম রচনা 'রামের সুমতি' গল্প প্রকাশ। রেঙুনে পুনরায় 'চরিত্রহীন' উপন্যাস রচনা আরম্ভ। ফণীন্দ্রনাথ পাল কর্তৃক 'বড়দিদি' প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রথম রচনা 'বিরাজবৌ'।

১৯১৪ 'যমুনা'র অন্যতম সম্পাদকরূপে ঘোষণা।

১৯১৫ অল্পদিনের জন্য সস্ত্রীক কলকাতায় আগমন। চোরবাগানে সাময়িকভাবে অবস্থান। সবান্ধবে নিয়মিত সাহিত্যের আড্ডা।

'যমুনা'র সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ ও 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় নিয়মিত রচনা প্রকাশ।

১৯১৬ রেঙুন জুবিলী-হল্-এ 'বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাবে'র উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা সভায় পঠিত অভিনন্দনপত্র রচনা।

স্বাস্থ্যহানির জন্য এক বছরের অবকাশ গ্রহণ ও বর্মা ত্যাগের সংকল্প। বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাবে রেঙুন প্রবাসীদের সম্বর্ধনা। মে-মাসে বর্মা ত্যাগ।

চতুর্থ অধ্যায়

১৯১৬ হাওড়ার বাজে-শিবপুর অঞ্চলে অবস্থান। সাহিত্য সাধনায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ। বহু গ্রন্থ প্রকাশ। প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা।

১৯১৯ 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির' কর্তৃক গ্রন্থাবলী প্রকাশ। দেশবন্ধু
১৯২১ চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে পরিচয়।

'নারায়ণ' পত্রিকায় রচনা প্রকাশ। দেশের কাজে যোগদান। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে হাওড়ার বিরাট বিক্ষুব্ধ মিছিলে যোগদান।

কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ। হাওড়া কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত।

জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের 'গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনে' বিরাট সভায় 'শিক্ষার বিরোধ' শীর্ষক ভাষণ।

১৯২২ অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস কর্তৃক প্রথম পর্ব 'শ্রীকান্ত' গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ।

দেশবন্ধুর কারামুক্তি উপলক্ষে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে নাগরিক অভিনন্দন-সভার অভিনন্দন পত্র রচনা।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্যরূপে গয়া কংগ্রেসে যোগদান। বরিশাল সম্মেলনে দেশবন্ধুর সহিত একত্রে যাত্রা।

শিশিরকুমার ভাতুড়ীর পরিচালনায় 'আঁধারে আলো' গল্পটির চিত্ররূপ।

১৯২৩ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' পুরস্কার।

১৯২৪ নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের সহযোগিতায় 'রূপ ও রঙ্গ' নামে সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদনা।

১৯২৫ ঢাকার মুন্সিগঞ্জে, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব।

হাওড়ার পাণিত্রাস গ্রামে বড়দিদি অনিলা দেবীর বাড়ির সন্নিকটে গৃহনির্মাণ। পাণিত্রাসে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সেবা।

১৯২৬ সরকার কর্তৃক 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত।

১৯২৭ গোপনে বিভিন্ন বিপ্লবীর ছদ্মবেশে সামতাবেড়ের গৃহে

১৯২৮ আশ্রয়লাভ। রূপনারায়ণের বন্যায় পীড়িত ও আর্তদের সেবা। মেজ ভাই স্বামী বেদানন্দের সামতাবেড়েয় দেহত্যাগ।

শিশির-সম্প্রদায় কর্তৃক 'ষোড়শী'র প্রথম অভিনয়রজনীতে উপস্থিতি।

'১ম পর্ব শ্রীকান্ত'-র ইতালীয় অনুবাদ পাঠে রোমাঁ রোলাঁর নিকট 'পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক' আখ্যা লাভ।

৫৩-তম জন্মদিনে ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে দেশবাসীর সম্বর্ধনা।

১৯২৯ মালিকান্দা অভয় আশ্রমে বিক্রমপুর যুবক ও ছাত্র সম্মেলনীর

১৯৩০ সভাপতিত্ব। রংপুরে বঙ্গীয় যুব-সম্মেলনীতে সভাপতিত্ব। হাওড়া সি. এস. পি. সি. এ.-র চেয়ারম্যান-এর পদ গ্রহণ।

সামতাবেড় গ্রামে জমিদার-পত্তনীদার ও প্রজাদলের মধ্যে জলকর বিষয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা, শরৎচন্দ্রের মধ্যস্থতায় নিষ্পত্তি ও প্রজাদলের জয়লাভ।

১৯৩১ রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে মানপত্র রচনা ও সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব।

১৯৩২ টাউনহল্‌-এ নাগরিক ও সাহিত্যিকগণের অভিনন্দন গ্রহণ।

১৯৩৪ ফরিদপুর সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে 'বিশিষ্ট সদস্য'-রূপে মনোনীত। কলকাতায় ২৪ অশ্বিনী দত্ত রোডে নবনির্মিত গৃহে প্রবেশ।

১৯৩৬ সরকারী সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ-সভায় টাউন-হল্‌-এ উদ্বোধন-বক্তৃতা ও এ্যালবার্ট হল্‌-এ সভাপতিত্ব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট্. উপাধি লাভ। ঢাকা মুসলিম সাহিত্যসমাজে সভাপতিত্ব।

'রবিবাসরে' ৬১-তম জন্মদিন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অভিনন্দিত।

১৯৩৮ কলকাতার পার্ক নার্সিং হোম-এ ৬২ বছর বয়সে ১৬ই জানুয়ারী ১৯৩৮, ২রা মাঘ ১৩৪৪ সনে দেহত্যাগ।

'শরৎচন্দ্রিকা' রচনা প্রসঙ্গে যেসব বই আলোচনা করেছি :

সমগ্র শরৎ-রচনা

শরৎ-স্মরণিকা সিরিজ—শরৎ সমিতি প্রকাশিত

ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র—গিরীন্দ্রনাথ সরকার

ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র—
যোগেন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত, নরেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত

শরৎ-প্রতিভা—সতীশচন্দ্র দাস

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎপরিচয়, শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী—
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎ-পরিচয়—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র—ডক্টর সুবোধ সেনগুপ্ত

শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র—মোহিতলাল মজুমদার

স্মৃতিকথা—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শরৎসাহিত্যে পতিতা—মাখনলাল রায়চৌধুরী